ডকদ্দও ঈএঠই
ঈউওচঐঠ
আব্দুল্লাহ বিন হামাদ আর-রাকাফ

শিশুর ঈমান পরিচর্যা

আব্দুল্লাহ বিন হামাদ আর-রাকাফ

ح جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالربوة ، ١٤٤٣هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الركف ، عبدالله حمد عبدالعزيز
أسئلة الطفل الإيمانية باللغة البنغالية. / عبدالله حمد عبدالعزيز
الركف - ط١. - الرياض ،١٤٤٣هـ
١٥٢ ص ، ٢٣ X ١٦ سم
ردمك: ٨-٣٢-٨٣٥٢-٦٠٣-٩٧٨

١- التربية الإسلامية أ.مركز اصول (مترجم) ب.العنوان
ديوي ٣٧٧.١ ١٤٤٣/٤٣٧١

رقم الإيداع : ١٤٤٣/٤٣٧١
ردمك: ٨-٣٢-٨٣٥٢-٦٠٣-٩٧٨

مركز أصول
OsoulCenter

This book has been conceived, prepared and designed by the Osoul Centre. All photos used in the book belong to the Osoul Centre. The Centre hereby permits all Sunni Muslims to reprint and publish the book in any method and format on condition that 1) acknowledgement of the Osoul Centre is clearly stated on all editions; and 2) no alteration or amendment of the text is introduced without reference to the Osoul Centre. In the case of reprinting this book, the Centre strongly recommends maintaining high quality.

+966 11 445 4900
+966 11 497 0126
P.O.BOX 29465 Riyadh 11457
www.osoulcenter.com

بسم الله الرحمن الرحيم

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

লেখকের বক্তব্য

যাবতীয় প্রশংসা উভয় জগতের রব মহান আল্লাহ তা'আলার নিমিত্তে। সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশ্রেষ্ঠ নাবী মুহাম্মাদ ﷺ , তাঁর বংশধর এবং তাঁর সকল সাথীর উপর।

পৃথিবী সম্পর্কে একজন শিশুর দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে শৈশবের শুরুর বছরগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ; এই সময়কালে শিশু মস্তিস্কে গ্রথিত বুঝগুলো মৌলিক ভিত্তি হিসাবে বিবেচিত হয়, যা বিভিন্ন ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠন করে থাকে। তবে তা শিশুর মানসিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। এই সময়টা শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের জন্যও এটি সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ; যে বিকাশ তাকে দৃঢ়তার সাথে জীবন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহ যোগাবে। একজন উদ্ভাবনী, প্রাণবন্ত ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে জীবন চলতে সাহায্য করবে। শিশু তার শ্রুত এবং দর্শনীয় বিষয়গুলোর মাধ্যমে এই পৃথিবী সম্পর্কে একটি বিশেষ ধারণা গ্রহণ করে। জীবনের পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে বিভিন্ন পরিস্থিতির আলোকে এই দৃষ্টিভঙ্গির-ই পরিবর্তন বা বিকাশ ঘটে থাকে।

শৈশবের এই অধ্যায়ে একজন শিশুর জানার উৎস তার পিতা-মাতা। তাই পিতা-মাতা কতৃক শিশুর প্রতিপালন ভালো হলে সন্তান সঠিক পদ্ধতিতে ভালোভাবে গড়ে উঠবে। সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্ব তাদের কাঁধে অর্পিত। প্রিয় নাবীর ভাষায় এটিই বিবৃত হয়েছে: **'তোমরা সকলেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের সকলকেই নিজ নিজ অধীনস্তদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে'**। (সহীহুল বুখারী, হাদিস নং-২৫৫৮)

সত্যি বলতে, আমরা শাহাওয়াত (প্রবৃত্তি) ও শুবুহাতের (সংশয়) ফিতনায় ভরপুর এক সময়ে বসবাস করছি। ফলে সন্তান প্রতিপালনে আন্তরিকতাপূর্ণ সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা প্রতিটি পিতা-মাতার আবশ্যকীয় দায়িত্বে পরিণত হয়েছে। সন্তানদের অন্তরে পিতা-মাতা কর্তৃক রোপিত একটি বীজ মৃত্যুর পরে তাদের জন্য সাদাকায়ে জারিয়াহ হিসেবে ফল দিবে। বস্তুত সন্তান হলো সেই স্থায়ী আমাল যা মৃত্যুর পরেও অব্যাহত থাকে। প্রিয় নবীজী ﷺ আমাদের এটিই জানিয়েছেন: 'অথবা **পুণ্যবান সন্তান যে তার জন্যে দু'আ করবে**'। (সহীহ মুসলিম, হাদিস নং-১৬৩১)

আল্লাহ তা‘আলা পিতা-মাতাকে যেসব বিষয়ে অসিয়ত করেছেন তার অন্যতম সন্তান । তিনি বলেন: **‘আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে অসিয়ত করছেন’**। (সুরা আন-নিসা, আয়াত নং-১১) অর্থ্যাৎ হে পিতা-মাতাগণ! তোমাদের সন্তানরা তোমাদের নিকট আমানত। আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকে তাদের দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ সাধনের অসিয়ত করেছেন। তাই তোমরা তাদের সঠিক শিক্ষা দিবে, শিষ্টাচারের দীক্ষা দিবে, খারাপ বিষয়গুলো হতে বিরত রাখবে এবং আল্লাহর আনুগত্য ও সর্বদা তাঁর তাকওয়া ধারণের নির্দেশ দিবে। তাঁর ভাষায় শোনা যাক: **‘হে মু’মিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে রক্ষা কর ঐ অগ্নি হতে যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর’**। (সুরা আত-তাহরীম-০৬)

প্রতিটি সন্তান পিতা-মাতার নিকট অসিয়তকৃত সম্পদ। তারা সেই অসিয়ত বাস্তবায়ন করলে পুরস্কৃত হবেন। আর তা বিনষ্ট করলে হবেন রবের শাস্তির অধিকারী। আয়াত থেকে এটিও প্রমাণ হয় যে, আল্লাহ তা‘আলা বান্দাদের প্রতি পিতা-মাতার চেয়েও অধিক দয়াবান।

অতএব, পরিবারে একজন শিশুর প্রতিপালন সুন্দরভাবে সম্পূর্ণ হলে, বহির্বিশ্বের সাথে তার আচরণ হবে অতি সুন্দর। অপরপক্ষে পরিবার শিশুর প্রতিপালন এবং তাকে সঠিক ঈমানী চেতনায় গড়ে তুলতে ব্যর্থ হলে, অদূর ভবিষ্যতে সে সকল প্রকার প্রশংসনীয় আচরণ হারিয়ে ফেলবে। কেবলমাত্র ভুল শুধরিয়ে দেয়ার নাম প্রতিপালন নয়; বরং বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে শরীয়াতের বিধানাবলী ও দ্বীনের মূলনীতিগুলো তার সামনে তুলে ধরা এবং এগুলোর সঠিক শিক্ষার বীজ তার মধ্যে বপন করাও প্রতিপালনের পর্যায়ভুক্ত। যাতে এগুলো তার মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে যায়।

পুস্তকটিকে ভাগ করা হয়েছে দুটি অধ্যায়ে। প্রথম অধ্যায় ঈমানী প্রতিপালন সম্পর্কে। এই অধ্যায়ে অনেক মূলনীতি বিবৃত হয়েছে যা পিতা-মাতাদের জন্য সন্তান প্রতিপালনে সহায়ক হবে, বি ইযনিল্লাহি তা‘আলা। আর দ্বিতীয় অধ্যায়ে শিশুদের ঈমানী জিজ্ঞাসার উত্তরের প্রয়োগিক নমুনা আলোচিত হয়েছে। এখানে বয়সভেদে তরুণদের মাঝে সর্বাধিক প্রচলিত প্রশ্নগুলো একত্র করা হয়েছে; বিশেষত ঈমানের ছয় রুকন সম্পর্কিত প্রশ্নাবলী। আরও বিবৃত হয়েছে কিভাবে এ প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে হবে।

আল্লাহ তা‘আলা তাওফীকদাতা এবং তিনি সঠিক পথ প্রদর্শনকারী।

আব্দুল্লাহ বিন হামাদ আর-রাকাফ

বিষয়-সূচি

১০ ঈমানী প্রতিপালন

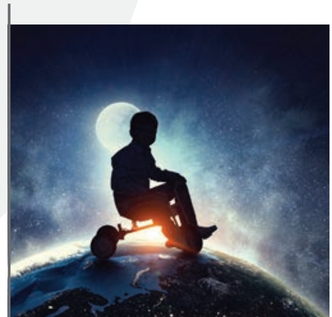

শিশুর ঈমানী প্রতিপালন ও শিক্ষা-দীক্ষা ২৬

৫২ ঈমানী লালন-পালনের স্তম্ভসমূহ

উত্তর পরিচিতি ৭৬

৯৬ শিশুর ঈমান বিষয়ক প্রশ্নের উত্তরের বাস্তবিক কিছু নমুনা

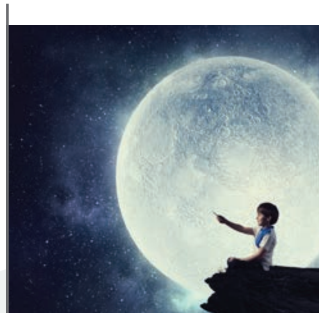

ঈমানী প্রতিপালন

তারবিয়্যাহ

তারবিয়্যাহ বা প্রতিপালন মানব গড়ার এক অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শিশুর গঠন এবং তাকে প্রতিষ্ঠিত করার এক মোক্ষম হাতিয়ার। প্রতিপালনের মাধ্যমেই একজন শিশুর সামাজিক, শিক্ষাগত, মানসিক ও দৈহিকসহ অন্যান্য ব্যক্তিত্বের গঠন সম্পূর্ণ হয়। ঈমানী প্রতিপালন এবং এর গুরুত্ব আলোচনা করার পূর্বে তারবিয়্যাহ এর অর্থের সাথে পরিচিত হওয়া জরুরী।

তারবিয়্যাহ বলতে যা বোঝায়:

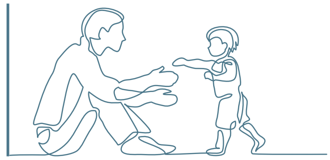

তারবিয়্যাহ বা প্রতিপালন হলো কতগুলো নিয়ম-নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত উদ্দেশ্যমূলক উনড়বত কিছু কর্মকান্ডের সমষ্টি, যার উদ্দেশ্য দিক নির্দেশনা এবং অনুশীলনের মাধ্যমে সুন্দর সুন্দর অভ্যাসগুলো গঠন করা। নবজাতকের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যগুলো সংরক্ষণ এবং রব প্রদত্ত তার প্রতিভা ও যোগ্যতাগুলোর বিকাশ সাধনের প্রতি তারবিয়্যাহ সবিশেষ গুরুত্বারোপ করে। তারপর এই স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য ও প্রতিভা যেন তার কল্যাণ বয়ে আনে, সেদিকে এগুলোকে প্রবাহিত করে। যার ফলে বেরিয়ে আসে পৃথিবী আবাদের যোগ্য মানুষ। তাই তারবিয়্যাহ হলো সেই হাতিয়ার, যা জীবনের সকল ক্ষেত্রে নেতৃত্ব তৈরী করে।

ঈমানী প্রতিপালনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য:

ঈমান মানব অস্তিত্বের সবচেয়ে বড় সম্পদ, মানুষের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মোকাদ্দামা। এটি পার্থিব জীবনে মানুষের চলার পথের ক্রসিং পয়েন্ট। রবের ভাষায়: **‘অতঃপর তাদের মধ্যে কেউ ঈমান এনেছে এবং কেউ কুফরী করেছে’**। (সুরা আল-বাকারাহ, আয়াত নং-২৫৩) মানুষের সকল কর্মকান্ড এর উপর নির্ভরশীল। এর উপর রচিত হবে পরকালে তাদের জান্নাত বা জাহান্নাম। মানব জীবনে ভালো-মন্দের পার্থক্য গড়ে দেওয়া অধ্যায়গুলোর অন্যমত শৈশবকাল। কারণ এ সময় শিশুর মনে যেসব বিশ্বাস, মূল্যবোধ, অভ্যাস এবং দৃষ্টিভঙ্গি রোপন করা হয়, সেগুলো মূলোৎপাটন করা তো অনেক দূরের কথা পরিবর্তন করা অত্যন্ত কঠিন। । কখনও কখনও ব্যক্তি বিশেষে সারা জীবন এর প্রভাব রয়ে যায়। তাই শৈশবকালে ঈমানী প্রতিপালন অন্যতম মৌলিক অধ্যায়; এই পৃথিবীতে মানুষের গোটা জীবন যার উপর নির্ভর করে পরিচালিত হবে।

সারসংক্ষেপে, তারবীয়্যাহ বা লালন-পালন হলো গুরুত্ব দেওয়া বা যত্ন নেওয়া। যথাযথ যত্ন নেওয়া ছাড়া সঠিক লালন-পালন সম্ভব নয়। আর ঈমান রোপনে গুরুত্বারোপ করার চেয়ে উত্তম গুরুত্বারোপ আর কী-ই-বা হতে পারে! অধুনাকালে তারবীয়্যাহ বিষয়ক গবেষকদের মনোযোগ লালন-পালনের বুদ্ধিবৃত্তিক এবং দৈহিক দিকের উপর আবদ্ধ। বিশ্বাসগত এবং আধ্যাত্মিক দিকটিকে তারা পাত্তা দেন না। তারা বস্তুবাদী মানদন্ডে জাগতিক সফলতা বাস্তবায়নে তাদের থিসিসগুলো পেশ করে থাকেন। দ্বীনের উপর অটল থাকার বিষয়টিতে তারা গুরুত্ব দেন না, অথচ এর উপর পরকালীন সফলতা নির্ভরশীল। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তারবীয়্যাহ সংক্রান্ত আমাদের এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গির মাঝে বিস্তর ফারাক পরিলক্ষিত হয়।

নববী যামানায় যে স্তম্ভগুলোর উপর তারবীয়্যাহ এর ভিত্তি স্থাপিত ছিল, ঈমানী তারবীয়্যাত তার মধ্যে অন্যতম। বিষয়টি জানার জন্য ইবনু উমার রা. এর কাছে যাওয়া যাক। তিনি জানাচ্ছেন, আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছিঃ **‘তোমরা সকলেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের সকলকেই নিজ নিজ অধীনদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে। রাষ্ট্রপতি দায়িত্বশীল, তাকে তার অধীন প্রজা-সাধারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। পুরুষ তার পরিবার-পরিজনদের কর্তা। তাকে তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে। স্ত্রী তার স্বামী-গৃহের কর্ত্রী, তাকে তার অধীনস্থদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে’**। (সহীহুল বুখারী, হাদিস নং-২৫৫৮, মুসলিম, হাদিস নং-১৮২৯) অত্র হাদিসে নাবী ﷺ আমাদের প্রত্যেকের কাঁধে অর্পিত গুরুদায়িত্বের বিষয়ে

সতর্ক করেছেন। আর অবহিত করেছেন যে, আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ অধীনদের জন্য কী করেছি সে বিষয়ে অবশ্যই প্রশ্নের মুখোমুখি হবো। অন্য একটি হাদিসে বিষয়টি আরও খোলাসা হয়। নজর বুলা যাক সেটিতে: **'যদি কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ প্রজা পালনের দায়িত্ব অর্পণ করেন, আর সে কল্যাণ কামনার সাথে তাদের তত্ত্বাবধান না করে, তাহলে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না'**। (সহীহুল বুখারী, হাদিস নং-৭১৫০) এ হাদিসে আন্তরিকতা এবং বিশ্বস্ততার সাথে কল্যাণ কামনার গুরুত্বের বিষয়টি উঠে এসেছে। যেন কল্যাণকামিতায় ব্যাপকতা থাকে, যা ব্যাক্তির সার্বিক কল্যাণকর দিককে অন্তর্ভুক্ত করবে। এ বিষয়ে ইবনু উমার রা. হতে একটি আসার বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন: **'তোমরা সন্তানকে শিষ্টাচার শিক্ষা দাও। কারণ; তুমি তার শিষ্টাচারের বিষয়ে জিজ্ঞেসিত হবে, তার শিক্ষার বিষয়ে প্রশ্নের মুখোমুখি হবে। আর সে তোমার সাথে সদাচারণ এবং তোমার আনুগত্য সম্পর্কে জিজ্ঞেসিত হবে'**। (বায়হাকী কতৃক রচিত শুয়াবুল ঈমান, হাদিস নং-৮১৪১) এখানে ইবনু উমার রা. নিশ্চিত করেছেন যে, দায়িত্বের ভারটি প্রথমে পিতা-মাতার কাঁধে এসে পড়ে। তারাই সন্তানের আদব-আখলাক শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রথম ও প্রধান উৎস। তারবীয়্যাহ বিষয়ে কতগুলো প্রবচন রয়েছে। যেমন: **'সন্তানদের সঠিক প্রতিপালন সাদাকাহ করার চেয়ে উত্তম'**। **'সন্তানকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া এক সা' সাদাকাহ করার চেয়ে উত্তম'**। (তিরমিযী, হাদিস নং-১৯৫১, সিলসিলা যঈফাহ, হাদিস নং-১৮৮৭)। **'সন্তানকে উত্তম চরিত্রের সবক দেওয়া সকল প্রকার দান হতে উত্তম'**। **'সন্তানের প্রতি পিতার সবচে বড় দান উত্তম শিষ্টাচার'**। (তিরমিযী, হাদিস নং-১৯৫২, সিলসিলা যঈফাহ, হাদিস নং-১১২১)। উপরর্যুক্ত বক্তব্যসহ অন্যান্য বক্তব্যগুলো প্রমাণ করে, পিতা-মাতা সন্তানের জন্য যা করেন তন্মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো তার লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি মনোযোগ দেওয়া।

আমরা অতীতে তুলনামূলক আবদ্ধ পরিবেশে সন্তান প্রতিপালন করতাম। কিন্তু বর্তমানে প্রতিপালন করি এক উন্মুক্ত পরিবেশে। ইন্টারনেটের বদৌলতে আমাদের

গৃহের দরজা জানালাগুলো পৃথিবীর সব প্রান্তের সাথে সম্পৃক্ত। স্বভাবতই এর ভালো-মন্দ উভয় দিক বিদ্যমান। আমাদেরকে সর্তকতার সাথে ঘটমান বিষয়গুলো বুঝতে হবে। অন্যথায় খারাপ দিকগুলো ভালো দিকের উপর প্রভাব বিস্তার করবে। চারপাশে ঘটমান দ্রুত পরিবর্তনগুলো লক্ষ্য করলে, আমরা সেগুলোর বৈশিষ্ট্য বুঝতে সক্ষম হবো। একজন অভিভাবককে এ বিষয়ের প্রতি যথাযথ গুরুত্বারোপ করতে হবে। তাহলে শিশুদের অন্তরে ঈমানী তাৎপর্যগুলো বদ্ধমূল করার সুযোগ পাবে। এটি পারিবারিক সহযোগিতামূলক পরিবেশের মাধ্যমে সম্পূর্ণ হবে। আবার যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এ বিষয়ের প্রতি যত্নশীল, সেগুলো নির্বাচনের মাধ্যমেও বাস্তবায়িত হবে। আর এ পরিবর্তনগুলো বুঝতে ব্যর্থ হলে, এমন ক্ষতি হয়ে যাবে যা পুষিয়ে নেয়ার কোন পথ থাকবে না। তবে ধারাবাহিক প্রতিপালন এবং ধৈর্যের মাধ্যমে আমরা সম্ভাব্য সবচেয়ে ভালো ফল লাভে সক্ষম হবো, বি ইযনিল্লাহি তা'আলা। লালন-পালনের ক্ষেত্রে সাময়িক নির্দেশনা যথেষ্ট নয়; বরং এতে নিয়মিত খোঁজখবর রাখা আর ধারাবাহিক নির্দেশনা খুব বেশি জরুরী।

ঈমানী প্রতিপালনের আবশ্যকতা:

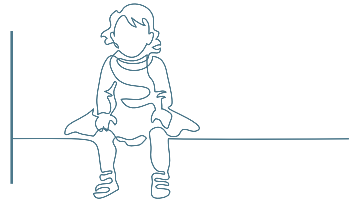

বর্তমানে শিশুরা বসবাস করছে মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিস্ফোরনের উন্মুক্ত এক যুগে। তাদেরকে চারদিক থেকে বেষ্টন করে রেখেছে অনেকগুলো চুম্বক। সেগুলো আমাদের ধারণার চেয়েও অধিক ভয়াবহ। মানব অস্তিত্বের সবচেয়ে কঠিন কাজটি আমরা সম্পাদন করে থাকি। আর তা হলো লালন-পালন ও শিক্ষাদান। উম্মতকে এ কাজের আঞ্জাম দিতেই হবে। কিছু পয়েন্ট আছে যা শিশুদের ঈমানী প্রতিপালনের আবশ্যকতা এবং এর তীব্র প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলে। যথা: **১. মানুষদের (বিশেষত শিশুদের) ঈমানের পথে ডাকা এবং এর শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি গুরাত্বারোপ করা নাবী-রাসূল সহ পরবর্তী সংস্কারকদের মানহাজ**। কুরআনে আল্লাহ তা'আলা নাবীদের বিষয়গুলো কোড করেছের। নূহ عليه السلام স্বীয় পুত্রকে ঈমানদারদের সঙ্গী হতে এবং বিপথগামীদের সঙ্গ ত্যাগ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন: **'হে আমার পুত্র! আমাদের সঙ্গে আরোহণ কর এবং কাফিরদের সঙ্গী হইও না'**। (সুরা হুদ, আয়াত নং-৪২)

ইবরাহীম عليه السلام নিজ সন্তানদের উপদেশ দিয়ে বলেন: **'আর ইবরাহীম, ইয়াকুব স্বীয় সন্তানগণকে সদুপদেশ প্রদান করেছিল, হে আমার বংশধর! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্যে এই দীন (জীবন ব্যবস্থা) মনোনীত করেছেন, অতএব তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ কর না'**। সুরা আল-বাকারাহ, আয়াত নং-১৩২)

লোকমান হাকীম তার সন্তানকে শিরক হতে সতর্ক করে বলেন: **'হে আমার ছেলে ! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক কর না। নিশ্চই শিরক মহা যুলুম'**। (সুরা লোকমান, আয়াত নং-১৩)

নাবী মুহাম্মাদ ﷺ ইবনু আব্বাস রাযি: কে উপদেশ দিয়ে বলেন: **'বৎস! আমি তোমাকে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিখিয়ে দিচ্ছি। তুমি আল্লাহ তা'আলার বিধিবিধানগুলো সংরক্ষণ করলে তিনি তোমাকে সব খারাপি হতে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহ তা'আলার বিধিবিধানগুলো সংরক্ষণ করলে তোমার প্রয়োজনে তাঁকে কাছে পাবে। কোন কিছু চাইলে তাঁর কাছেই চাইবে। সাহায্যের প্রয়োজন হলে তাঁরই সাহায্য চাইবে'**। (তিরমিযী, হাদিস নং-২৫১৬)

উপরোক্ত হাদিসে ঈমানী তারবীয়্যাতের গুরুত্বের বিষয়টিই জ্বলজ্বল করছে।

২. আমরা জানি, তাওহীদ বা ঈমানী শিক্ষা সব শিক্ষার মূল। শিশু মননে নববী পদ্ধতিতে ঈমানী শিক্ষা রোপিত হলে, ইবাদাতসহ দ্বীনের অন্যান্য বিষয়গুলো ঈমানের অনুগামী হয়ে এমনিতেই চলে আসবে। ঈমানী শিক্ষার প্রতি যত্নশীল হলে, আল্লাহর পক্ষ হতে তাওফীক ও হেদায়েত লাভ করা যাবে। কারণ; অনেক বিষয়কে আল্লাহ তা'আলার প্রতি এবং পরকালের প্রতি ঈমানের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ঈমানের স্তর অনুযায়ী মানুষ আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয় হতে বেঁচে থাকতে পারবে।

৩. আমরা দেখি, কিছু অভিভাবক শিশুদের ঈমানী শিক্ষাদানের বিষয়টি অবহেলা করেন এই যুক্তিতে যে, তারা ছোট রয়েছে। অথচ বড় হয়ে গেলে আর শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় না। যে নিজ শিশুকে উপকারী বিষয় শিক্ষা দিতে অবহেলা করল আর তাকে বৃথা রেখে দিল, সে অত্যন্ত গর্হিত কাজ করল। অধিকাংশ সন্তান নষ্ট হওয়ার পিছনে পিতা-মাতা দায়ী। কারণ; তারা তাদের অবহেলা করেন। শিক্ষা দেন না দ্বীনের ফরয ও সুন্নাত বিষয়গুলো। ফলে অল্প বয়সে তারা নষ্ট হয়ে যায়। বড় হয়ে তারা না নিজেদের কোন উপকার করতে পারে, না পিতা-মাতার কোন উপকারে আসে।

৪. মিডিয়াতে শিশু কেন্দ্রিক ভিডিও, অডিও এবং অন্যান্য প্রোগ্রামের ছড়াছড়ি। এইসব প্রোগ্রাম শিশুদের মনে বিকৃত বুঝ এবং কুৎসিত দৃষ্টিভঙ্গি ছড়িয়ে দেয়। তাই এগুলোর প্রতিরোধে ঈমানী প্রতিপালন একান্ত জরুরী। ঈমানী প্রতিপালন হচ্ছে বিধিসম্মত মাধ্যম গ্রহণ করা। এটি প্রতিরক্ষামূলক উপাদান, যা শিশুকে প্রতিপালন সংক্রান্ত সমস্যায় পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করে। আবার সমস্যায় পড়ে গেলে তা প্রতিষেধকের কাজ করে। এটি পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের অন্যতম অধিকার। পৃথিবীতে সৌভাগ্যের কারণ এবং আখিরাতে পরিত্রাণের মাধ্যম হবে, বি ইযনিল্লাহ। আর পরকালে এটিই মানুষের মাঝে পার্থক্য গড়ে দিবে।

পরিশেষে বলা যায়, ঈমানী প্রতিপালন শিশুদের আধ্যাতিক স্থিরতা এবং মানসিক নিরাপত্তার যোগান দেয়। কারণ; জীবন নিয়ে বড় বড় প্রশ্নের জবাব এতেই নিহিত রয়েছে। ঈমানী প্রতিপালন কুরআনের দিকনির্দেশনা ও হাদিসের আলোকে গৃহীত। এটি স্বচ্ছ ঝর্ণা, স্পষ্ট পদ্ধতি ও আল্লাহমুখী যাত্রা। এছাড়াও এতে শিশুদের চাহিদা, বাস্তবতা ও প্রয়োগ উপযুক্ত প্রতিপালন পদ্ধতির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে; যাতে শিশুদের ব্যক্তিত্ব নির্মাণে তা ভারসাম্যপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়।

ঈমানী প্রতিপালনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমূহ:

প্রতিপালনের সর্বজনীন উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত দাসত্ব বাস্তবায়ন করা। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে হলে আরও অনেকগুলো শাখাগত লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে হবে। যেমন:

(এক) মুসলিম সন্তানদের সঠিক আক্বীদা শিক্ষাদান। যাতে সে জেনে শুনে আল্লাহর ইবাদাত করে এবং সৎ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

(দুই) মুসলিম সমাজের প্রত্যেক সদস্যের প্রশংসনীয় চারিত্রিক গুণাবলী ধারণ করা। এক্ষেত্রে রাসূল ﷺ একমাত্র আদর্শ, রাব্বে কারীম যাকে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সার্টিফিকেট দিয়েছেন: **'নিশ্চয়ই তুমি মহান চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছ'**। (সুরা আল-ক্বলাম, আয়াত নং-০৪)। সাথে সাথে নাবী ﷺ এর এ বাণীর প্রতিও আমাল হবে: **'আমি তো উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দেবার জন্য প্রেরিত হয়েছি'**। (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং-৮৯৩৯, আলবানী রহ: এর বিশ্লেষণে হাদিস সহীহ)

(তিন) মুসলিম সমাজের প্রত্যেক সদস্যের ভেতর সামাজিক চেতনাবোধ জাগ্রত করা। যাতে তাদের মাঝে সামাজিক ধারণার চেতনাবোধ শক্তভাবে গেঁথে যায়। ফলে তারা সামাজিক বিষয়াদি এবং এর উদ্বেগকে গুরুত্বের সাথে নিবে। সমাজের ভাইদের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখবে। এতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ পালন করা হবে। আল্লাহ তা'আলার ভাষায় শোনা যাক: **'মু'মিনরা পরস্পর ভাই ভাই'। (সুরা আল-হুজুরাত, আয়াত নং-১০)**। নাবী ﷺ আরও স্পষ্ট করেছেন: **'এক মু'মিন আরেক মুমিনের জন্য ইমারততুল্য যার এক ভাগ আরেক ভাগকে সুদৃঢ় করে'**। (সহীহুল বুখারী, হাদিস নং-৬০২৬) **'পারস্পরিক দয়া, ভালোবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শনে তুমি মু'মিনদের একটি দেহের মত দেখবে। যখন শরীরের একটি অঙ্গ রোগে আক্রান্ত হয়, তখন এর সকল অঙ্গ-প্রতঙ্গ রাত জাগে এবং জ্বরে অংশ নেয়'**। (সহীহুল বুখারী, হাদিস নং-৬০১১)
আর এর মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর মাঝে খাঁটি ঈমানী বন্ধনগুলো শক্তিশালী হবে।

(চার) মানসিক এবং আবেগপ্রবণতার দিক থেকে ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তি গঠন। এটি সমাজের জন্য উপকারী এবং সক্রিয় সদস্য গঠনে সহায়তা করবে। ফলে সে পৃথিবী পরিচালনা আর এর ভার বহনে নিজ ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে। আল্লাহ তা'আলা যেখানে তাকে খলিফা বানিয়েছেন।
সঠিকভাবে ঈমানী প্রতিপালান শুরু করার প্রয়োজনীয়তা কত বেশি উপর্যুক্ত আলোচনা হতে তা প্রতীয়মান হয়। এটি অব্যাহতভাবে আত্মিক শক্তি যোগায়, ব্যক্তিসত্তার চালিকাশক্তির বিকাশ সাধন করে, খারাপ কাজে বাধাদানকারী নিজের ভিতরের শক্তি বাড়ায় এবং কথা কাজে প্রাণশক্তি ছড়িয়ে দেয়। ফলে আত্মিক তারবীয়্যাতের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কাজগুলো করা ব্যক্তির জন্য সহজ হয়ে যায়।

ঈমানী প্রতিপালনের ভিত্তিসমূহঃ

ঈমানী প্রতিপালনের প্রাসাদ স্থাপনের কতগুলো বুনিয়াদ রয়েছে। সেগুলোকে দুইভাবে প্রকাশ করা যায়। (এক) তাত্ত্বিক বুনিয়াদ ও (দুই) প্রায়োগিক বুনিয়াদ।

তাত্ত্বিক বুনিয়াদকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ ইলম ও ঈমান।

ইলম হল বোধশক্তি এবং ব্যক্তি আচরণ গঠনের সবচে বড় চাবি। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ **'তুমি বল! যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে? জ্ঞানবান লোকেরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে'**। (সুরা আয-যুমার, আয়াত নং-৯)

নাবী ﷺ তাঁর সাহাবাদের উপকারী জ্ঞান শিক্ষাদানে সর্বদা আগ্রহী ছিলেন। তিনি তাদের উপকারে আসে না এমন জ্ঞান হতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাইতে বলেছেন। তাদেরকে শেখানো দু'আটি তিনি আমাদের জানাচ্ছেনঃ **'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট পানাহ চাই এমন 'ইল্ম হতে যা কোন উপকারে আসবে না। এমন অন্তঃকরণ থেকে যা আল্লাহর ভয়ে ভীত হয় না। এমন আত্মা থেকে যা কক্ষনও তৃপ্ত হয় না। আর এমন দু'আ থেকে যা কবূল হয় না'**। (সহীহ মুসলিম, হাদিস নং-২৭২২)

আর ঈমান হল ছয় রুকনসহ সন্তানদের অন্তরে যেটি গেঁথে দেওয়া হয়। এটি ব্যাপকার্থবোধক একটি পরিভাষা যা ইহজগত ও পরজগত সবকিছুকে বেষ্টন করে আছে। নাবী ﷺ উম্মতের সন্তানদের অন্তরে সঠিক শক্তিশালী ঈমানী বিশ্বাসগুলো রোপনের দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।

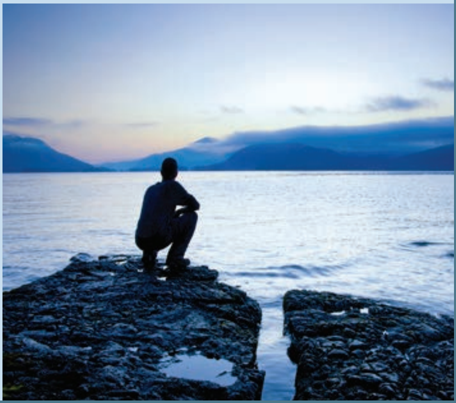

আর প্রায়োগিক বুনিয়াদকে ভাগ করা যায় তিন ভাগে। যথা: (এক) দাসত্বমূলক, (দুই) বাস্তবায়নমূলক ও (তিন) চারিত্রিক।

প্রথম ভাগ: দাসত্বমূলক; ফলপ্রসূ তারবিয়্যার জন্য দুটি বিষয় অত্যন্ত জরুরী। খাঁটি অন্তর গঠন এবং স্বতন্ত্র ব্যক্তি গুণাবলীর বিকাশ। তাহলে তা সন্তানদের ব্যক্তিসত্তা গঠন করতে পারবে। ফলে সে সর্বদা জীবনকে রবের সাথে সম্পৃক্ত ও একনিষ্ঠ অবস্থায় পাবে। তার আচরণ ও চিন্তা সঠিক ধারায় প্রবাহিত হবে। বরং তার আশা প্রত্যাশাগুলোও সঠিক পথ হারাবে না। দেখুন না! নাবী ﷺ মুয়ায রাযি: কে কিভাবে ইবাদাতের বিষয়টি শিক্ষা দিচ্ছেন। আল্লাহর শপথ! মুয়ায, আমি তোমাকে ভালোবাসি। তুমি প্রতি ফরয সলাতের পরে এ দু'আ পড়তে ভুলবে না: **'হে আল্লাহ! আপনার স্মরণে, আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে এবং আপনার উত্তম 'ইবাদতে আমাকে সাহায্য করুন'।** (আবু দাউদ, হাদিস নং-১৫২২, আলবানী রহ: এর বিশ্লেষণে হাদিসটি সহীহ)

তিনি মুয়ায রাযি: কে শিক্ষা দিলেন: ইবাদাত রবের পক্ষ হতে বান্দার প্রতি অনুকম্পা। শুধু চেষ্টায় তা অর্জন করা যায় না। বরং রবের তাওফীক লাগে। তাঁর তাওফীক ছাড়া তুমি কোন ইবাদাত করতে পারবে না। আরও বললেন: ইবাদাত করতে চাইলে সর্বদা তাঁর সাহায্য চাইতে হবে। ফলে মুয়ায রাযি: এর অন্তরে এ বিষয়টি মজবুত হয়ে গেল যে, মু'মিন রবের ইবাদাত করতে চাইলে তাকে অবশ্যই তাঁর সাহায্যের ভিখারি হতে হবে। এজন্য তাঁর উপর তাকে পরিপূর্ণ ভরসা করতে হবে। কারণ; তিনি যাকে চান তাঁর আনুগত্যের তাওফীক দেন।

দ্বিতীয় ভাগ: বাস্তবায়ন মূলক; আমল ছাড়া ইলম অর্থহীন। দুনিয়া- আখিরাতে আমল মানুষদের মাঝে শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম মানদন্ড। রবের ভাষায় শুনি: **'অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে, আবার কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও সে দেখতে পাবে'।** সুরা আয-যিলযালাহ, আয়াত নং-৭,৮)

তৃতীয় ভাগ: চারিত্রিক; ইসলামের মানহাজই হলো মানুষকে উন্নত চরিত্রের অধিকারী বানানো। এমনকি স্বয়ং নাবী ﷺ তাঁর রিসালাতের সমস্ত দায়িত্বকে একটি অর্থের মধ্যে স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ দেখেন। আর তা হল উত্তম চরিত্র এবং এর উপর প্রতিপালন। স্বীয় লক্ষ্য সম্পর্কে তিনি জানাচ্ছেন: **'সর্বোত্তম স্বভাব-চরিত্রের পূর্ণতা দান করার জন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি'।** (মুসনাদ আহমাদ, হাদিস নং- ৮৯৩৯, সহীহ আল-জামে', হাদিস নং-২৩৪৯, আলবানী রহ: এর বিশ্লেষণে এর সনদ সহীহ)

আবার উত্তম চরিত্র অর্জনে প্রণোদনা দিয়ে বলেন: **'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তির চরিত্র ও আচরণ সর্বোত্তম সে-ই আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। কিয়ামত দিবসেও সে আমার খুবই নিকটে থাকবে'।** (তিরমিযী, হাদিস নং-২০১৮, আলবানী রহ: এর বিশ্লেষণে হাদিসটি সহীহ)

আর তাই, চরিত্র হল ঈমানী প্রতিপালনের বাহ্যিক ফলাফল।

ঈমানী প্রতিপালনের কিছু নমুনাঃ

বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে কোন মূল্যবোধ যত সহজে অন্তরে এঁটে দেওয়া যায়, অন্য কোন মাধ্যমে তত সহজে সম্ভব হয় না। নাবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবারা শিশুদের ঈমানী ভিত্তি গঠনে কেমন নীতি অবলম্ব করতেন, তা বুঝানোর জন্য আমরা এখানে কিছু নমুনা তুলে ধরছি:

১- ইবনু আব্বাস রাযিঃ জানাচ্ছেন। নাবী ﷺ নিম্নোক্ত দু'আটি পড়ে হাসান ও হুসাইনের উপর ঝাড়-ফুঁক করে পানাহ চাইতেন এবং বলতেন, তোমাদের পিতা [ইবরাহীম ('আঃ)]-ও এটি পাঠ করে ইসমা'ঈল ও ইসহাকের উপর ঝাড়-ফুঁক করে পানাহ চাইতেন। দু'আটি হল, "আ'ঊযু বিকালিমাতিল্লা-হিত্ তা-ম্মাতি মিন কুল্লি শাইত্ব-নিও ওয়া হা-ম্মাতিন, ওয়া মিন কুল্লি 'আইনিন লা-ম্মাতিন। অর্থাৎ, আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমার মাধ্যমে প্রত্যেক শাইত্বান, বিষাক্ত প্রাণী এবং প্রত্যেক কুদৃষ্টির অনিষ্ট হতে পানাহ চাচ্ছি। (সহীহুল বুখারী, হাদিস নং-৩৩৭১)।

২- আবু হুরায়রা রাযিঃ নাবী ﷺ এর বরাতে জানাচ্ছেন: **‘কোন শিশুই ফিতরাত (ইসলাম) ব্যতীত অন্য কোন অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয় না। অতঃপর পিতা-মাতা তাকে ইয়াহূদী, খৃস্টান অথবা অগ্নিপূজক বানায়’..**। (সহীহুল বুখারী, হাদিস নং-১৩৫৮)

৩- আমর ইবনু আবী সালামাহ রাযিঃ নাবী ﷺ এর সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনার স্মৃতিচারণ করে বলেন, **‘আমি একজন বালক হিসেবে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর তত্ত্বাবধানে ছিলাম। খাবার-পাত্রে এক জায়গায় আমার হাত স্থির থাকত না। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, হে বালক! আল্লাহর নাম নিয়ে (বিসমিল্লাহ বলে) খাওয়া আরম্ভ কর। ডান হাতে খাবার খাও। আর নিজের সামনে থেকে খাও’**। (সহীহুল বুখারী, হাদিস নং-৫৩৭৬, সহীহ মুসলিম, হাদিস নং-২০২২)।

৪- ইবনু আব্বাস রাযিঃ কে নাবী ﷺ কী চমৎকারভাবে শিক্ষা দিচ্ছেন! চলুন, ঘুরে আসি সেখান থেকে। তিনি জানাচ্ছেন: **‘কোন এক সময় আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পিছনে ছিলাম। তিনি বললেন: বৎস! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি- তুমি আল্লাহ তা‘আলার বিধি-নিষেধ রক্ষা করবে, আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখবে, আল্লাহ তা‘আলাকে তুমি কাছে পাবে। কোন কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হলে আল্লাহর নিকট চাও। আর সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে আল্লাহর নিকটেই কর। জেনে রাখো, যদি সকল উম্মাত তোমার কোন উপকারের উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহলে ততটুকু উপকারই করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন’**। (তিরমিযী, হাদিস নং-২৫১৬)।

৫- নাবী দৌহিত্র হাসান রাযিঃ জানাচ্ছেন কিভাবে আদর করে তার নানা তাকে শিক্ষা দিতেন। শোনা যাক তার মুখ থেকেই: **‘রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে কতগুলো বাক্য শিখিয়েছেন। আমি সেগুলো বিতর সলাতে পাঠ করে থাকি। অর্থ্যাৎ হে আল্লাহ! যাদেরকে তুমি হিদায়াত করেছো আমাকেও তাদের সাথে হিদায়াত**

কর। যাদের প্রতি উদারতা দেখিয়েছ তুমি তাদের সাথে আমার প্রতিও উদারতা দেখাও। তুমি যাদের দায়িত্ব গ্রহণ করেছ তাদেও সাথে আমার দায়িত্বও গ্রহণ কর। তুমি আমাকে যা দান করেছ তার মধ্যে বরকত দাও। তোমার নির্ধারিত খারাবি হতে আমাকে রক্ষা কর। কেননা তুমিই নির্দেশ দিতে পার, তোমার উপর কারো নির্দেশ চলে না। যাকে তোমার বন্ধু ভেবেছ, সে কখনও অপমানিত হয় না। তুমি কল্যাণময়, তুমি সুউচ্চ'। (আবু দাউদ, হাদিস নং-১৪২৫, আলবানী রহঃ এর বিশ্লেষণে হাদিসটি সহীহ)।

৬- খাদিমুর রাসূল আনাস রাযিঃ এর নিকট শুনি নাবী ﷺ এর শিক্ষাপদ্ধতি কেমন ছিল। আল্লাহর রাসূল ﷺ একবার আমাকে বললেন: **'বৎস! তুমি যখন তোমার পরিবার-পরিজনের নিকট যাও, তখন সালাম দাও। তাতে তোমার ও তোমার পরিবার-পরিজনের কল্যাণ হবে'**। (তিরমিযী, হাদিস নং-২৬৯৮, আলবানী রহঃ এর বিশ্লেষণে হাদিসটি হাসান)।

৭- সাহাবী জুনদুব আল-বাজালী জানাচ্ছেন, **'আমরা নাবী ﷺএর সাথে ছিলাম। আমরা ছিলাম শক্তিশালী এবং সক্ষম যুবক। আমরা কুরআন শেখার পূর্বে ঈমান শিখেছি। তারপর কুরআন শিখেছি ফলে আমাদের ঈমান বেড়ে যায়'**। (ইবনু মাজাহ, হাদিস নং-৬১, আলবানী রহঃ এর বিশ্লেষণে হাদিসটি সহীহ)।

৮- আনাস রাযিঃ এর মা উম্মু সুলাইম আর-রুমাইসা রাযিঃ ইসলাম গ্রহণ করলেন। আনাস তখনও দুধ ছাড়েনি। মা তাকে শেখাতে লাগলেন: বল তো আব্বু, লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ। বল, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। মা যা বলাতেন তিনি তাই বলতেন। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা-৩০৫/২)।

৯- ইবরাহীম আত-তায়মী রহঃ বলেন: শিশু কথা বলা শিখলে সালাফরা তাকে সাতবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শিক্ষা দেওয়া ভালো মনে করতেন। ফলে শিশুর প্রথম কথাই হত এই কালেমা। (মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক-৭৯৭৭)।

শিশুর ঈমানী প্রতিপালন ও শিক্ষা-দীক্ষা

তারবীয়্যাহর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিশুর ঈমানী প্রতিপালন। কারণ এটি সুন্দরভাবে সম্পন্ন হলে শিশুর প্রশংসনীয় অভ্যাসগুলো গড়ে উঠবে। মস্তিস্কের গভীরে সঠিক বিশ্বাস মজবুত হবে। উৎকৃষ্ট চরিত্রগুলোর দিকনির্দেশনা পাবে। তার সকল কার্যকলাপে এ চারিত্রিক বিষয়গুলো পরিলক্ষিত হবে। জীবনের এ অধ্যায়ে শিশু পৃথিবী সম্পর্কে তার দর্শন ঠিক করে। এর আলোকে তার আচার-ব্যবহার, কার্যকলাপ আর অভ্যাসগুলো গড়ে উঠে। বাস্তব জীবনে এগুলোর বাস্তবায়নের আলোকে দুনিয়ায় তার সৌভাগ্য আর আখিরাতের সফলতার অংশ নির্ধারিত হবে। এগুলো পিতা-মাতার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় কুরআন তা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছে। আল্লাহ তা'আলার ভাষায়: **'আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে অসিয়ত করছেন'**। (সুরা আন-নিসা, আয়াত নং-১১)।

আর নাবী ﷺ তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন: **'কোন শিশুই ফিতরাত (ইসলাম) ব্যতীত অন্য কোন অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয় না। অতঃপর পিতা-মাতা তাকে ইয়াহূদী, খৃস্টান অথ বা অগ্নিপূজক বানায়'**। (সহীহুল বুখারী, হাদিস নং-১৩৫৮)।

এ হাদিস হতে অনেক বিষয় বেরিয়ে আসে। যথা:

১. ঈমান মানুষের স্বভাবজাত একটি বিষয়। এটির পরিবর্তন মানব জাতির বিপদ ডেকে আনে।

২. পিতা-মাতার দায়িত্ব এবং সন্তান প্রতিপালনে তাদের ভূমিকা।

৩. তারবীয়্যাহর ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রভাব।

জন্মলগ্নে মানুষের মন ঈমান ধারণের জন্য প্রস্তুত থাকে। কোন যুক্তি বা প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। অবশ্যই এটি মানব জাতির জন্য রবের বিশেষ অনুগ্রহ। তাই পিতা-মাতাকে এই অনুগ্রহের যথাযথ যত্ন নিতে হবে। এই ফিতরাত বা স্বভাবকে কালিমামুক্ত রাখতে হবে। কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক সঠিক দ্বীনের উপর সন্তানদের গড়ে তুলতে হবে। পরিবেশ কেন্দ্রিক তারবীয়্যাহর উপর নির্ভর করে থাকা যাবে না। গ্লোবালাইজেশানের এই যুগে গতানুগতিক প্রতিপালন শিশুকে বিপথে নিয়ে যাবে। প্রবৃত্তির দ্রবন আর ব্যক্তিত্বের দুর্বলতা তাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিবে।

নিষ্পাপ শিশুর অন্তর যেন কালিমামুক্ত এক স্বচ্ছ মুক্তা। সেখানে যে কোন কারুকার্য করা সম্ভব। কল্যাণকর বিষয়ের অভ্যাস করালে বা শিক্ষা দিলে সে এর উপর গড়ে উঠবে। সৌভাগ্যবান হবে দুনিয়া-আখিরাতে। পিতা-মাতা এবং শিক্ষকরাও তার এ সওয়াবে ভাগিদার হবে। আর ক্ষতিকর বিষয়ের অভ্যাস করালে বা পশুর মত অবহেলা করলে তার ধ্বংস অনিবার্য। এর গুনাহর একটি অংশ দায়িত্বশীলদের বহন করতে হবে। কারণ; সবচেয়ে উপযুক্ত গঠন শিশুকালে হয়ে থাকে। শিশুকালে সন্তানের যত্ন না নিয়ে ছেড়ে দিলে তাকে ফিরিয়ে আনা অত্যন্ত কঠিন।

যে শিশু পরিবারে শক্তিশালী ঈমানের অধিকারী হয়ে ইসলামের সঠিক শিক্ষা ধারণ করে, সর্বক্ষেত্রে সে বেড়ে ওঠে পিতা-মাতার অনুসরণ করে। পিতা-মাতার দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে দ্বীনের বিশেষ বুঝগুলো নির্মিত হয়। আমরা দেখি, অনেকে শারয়ী বিষয়গুলো শিশুর সামনে অনেক কঠিন করে উপস্থাপন করে। ফলে, এতে হিতে বিপরীত হয়। আবার শিশু যখন বেড়ে উঠে পিতা-মাতাকে শরিয়তের শিক্ষা ধারণ করতে না দেখেই, তখন ভবিষ্যতে এ শিশুর দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া অত্যন্ত দূরহ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কারণ; শিশুকালে তারা দ্বীনের প্রভাব দেখে নি। তাই তাদের মধ্যে দ্বীনি প্রবণতা গড়ে উঠে না।

শিশুর দ্বীনি বিকাশঃ

একজন শিশুর নিকট দ্বীনের ধারণা আরম্ভ হয় আল্লাহ তা'আলাকে কেন্দ্র করে। পর্যায়ক্রমে নতুন নতুন চিন্তার প্রকাশ ঘটতে থাকে। যেমনঃ সৃষ্টি, পরকাল, ফেরেস্তা, এবং শায়ত্বানের চিন্তা ইত্যাদি। শৈশবে দ্বীনি বিকাশের লক্ষণগুলো চারটি বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট হয়ঃ

১ **বাস্তবতাঃ** শিশু তার ধর্মীয় বুঝগুলোর উপর অনুভূত বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করে। এটা যতই বাড়তে থাকে, আস্তে আস্তে সেটি তার নিকট মূখ্য হয়ে দাঁড়ায়। প্রকৃত বাস্তবতা অনুধাবনে সক্ষম হয়। এবং বয়োসন্ধিকালে সে এটি যথাঅংশে স্থাপন করে।

২ **বাহ্যিকতাঃ** ছোটরা বাহ্যিকভাবে বড়দের ইবাদাত, দোয়াসহ সবকিছুতে অনুকরণ করে থাকে। এ সময় তারা এগুলোর অর্থ বুঝে না বা এগুলোর অন্তর্নিহিত গুঢ় রহস্য অনুধাবন করতে পারে না। তাই একজন অভিভাবকের উচিত, এই বয়সে শিশুর ঝোঁককে কাজে লাগানো। তাহলে সে ইসলামের রুকন এবং এর চারিত্রিক দিকগুলো, ঈমানের রুকন এবং এর প্রভাবগুলোতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে।

৩ **সুবিধাবাদ:** ছোটরা কিছু ইবাদাত পালন করে। সে বুঝতে পারে, এতে পিতা-মাতা, শিক্ষক এবং তার চারপাশের লোকেরা খুশি হয়। ফলে সে এটা করতে থাকে তাদের ভালোবাসা পাবার জন্য, নিজের কিছু সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে বা কোন শাস্তি এড়ানোর অভিলাসে। অভিভাবককে লক্ষ্য রাখতে হবে, কিভাবে শিশুর এই সুবধিাবাদী মনোভাবকে কাজে লাগিয়ে তার মধ্যে দ্বীনি বিষয়গুলোর বীজ বপন করা যায়।

৪ **পক্ষপাত:** শিশু প্রচন্ড আবেগী হয়ে তার ধর্মের পক্ষাবলম্বন করে। এতে তাকে তাড়িত করে কোন কিছুর দিকে নিজেকে সম্পৃক্ত করা বা কারও মৈত্রী হওয়ার স্বভাবজাত তাড়না। আর আল্লাহ তা'আলার মৈত্রীতে নিজেকে সম্পৃক্ত করার চেয়ে ভালো বিষয় আর কি হতে পারে!?

পূর্বের আলোচনা হতে আমরা ঈমানী তারবীয়্যাহ সুদৃঢ়করণের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারছি। তরুণদের অন্তরে ঈমানকে নিকটবর্তী করার জন্য পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের ঐকান্তিক চেষ্টা করা আবশ্যক। বিশেষত বিভিন্ন রঙ্গে ফিতনা আবির্ভাবের এই কঠিন যুগে। গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়গুলো নিয়ে পিতা-মাতার কাজ করা উচিত, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: এক. শিশুর অন্তরে ফিতরাহ বা দ্বীনী বিষয়গুলো গ্রহণের সহজাত প্রবৃত্তিকে প্রজ্জ্বলিত করা। এটি কালেমাতুত তাওহীদ শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। দুই. ঈমানের রুকনগুলো শক্তিশালী করা। এটি অর্জিত হবে আল্লাহ এবং তাঁর নাবীর ভালোবাসা মজবুত করা এবং কুরআন শিক্ষাদানের মাধ্যমে।

প্রতিটি শিশুর মনে সুপ্ত রয়েছে দ্বীনের বিষয়গুলো গ্রহণের সহজাত বাসনা। এটি পিতা-মাতার জন্য সন্তান লালন-পালনের দায়িত্বকে সহজ করে দেয়। ফিতরা হল দ্বীন গ্রহনের সহজাত বাসনা। অন্যান্য স্বভাবের ন্যায় এটিও অপরিবর্তনীয় একটি স্বভাব। একে নির্দেশনা দেওয়া যায়, এর উন্নয়ন সম্ভব কিন্তু একেবাবের পরিবর্তন করা যায় না। সৃষ্ট উদ্দেশ্য ছাড়াও এটিকে অন্যান্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা সম্ভব। কিন্তু ইসলাম একে শুধুমাত্র তার সৃষ্ট উদ্দেশ্যে ব্যবহারের নির্দেশনা দেয়।

যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর মুসলিম শিশুকে গড়ে তোলা উচিত তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঈমানের ছয় রুকন। এর মধ্যে আল্লাহর প্রতি ঈমানের বিষয়টি অতীব গুরুত্বের দাবী রাখে। আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তাঁর প্রতি ভালোবাসা ছাড়া অন্যান্য রুকন নিষ্ফল। আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভালোবাসা ছাড়া তাঁর প্রতি ঈমান পূর্ণতা পাবে না। তথা তাকে ভালোবাসলে, তাঁর আনুগত্য করতে হবে আর তাঁর দুশমনদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করতে হবে। দুনিয়ার সব ভালোবাসার উর্ধ্বে তিনি এ ভালোবাসাকে স্থান দিতে বলেছেন। তাঁর ভাষায়: '**বল : 'তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভ্রাতা, তোমাদের পত্নী, তোমাদের**

স্বগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা ভালোবাস, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত। আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না'। (সুরা আত-তাওবা-২৪)।

যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট, তাদের প্রথম বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিত্রিত করেছেন তাঁর প্রতি তাদের ভালোবাসাকে: **'হে মু'মিনগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ দ্বীন হতে ফিরে গেলে শীঘ্রই আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় আনবেন যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং যারা তাঁকে ভালোবাসবে; তারা মু'মিনদের প্রতি কোমল ও কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে; তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। তারা কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করবে না। আর এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন এবং আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ'**। (সুরা আল-মায়েদা-৫৪)।

তিনি এটিও জানিয়ে দিয়েছেন যে, খাঁটি তাওহীদ আল্লাহ তা'আলার প্রতি নিরংকুশ ভালোবাসা ছাড়া অর্জিত হবে না। যেমনটি তিনি আমাদের জানাচ্ছেন: **'আর মানুষের মধ্যে এরূপ কিছু লোক আছে- যারা আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে তাঁর সাথে শরীক স্থির করে, তাদেরকে আল্লাহর ভালোবাসার ন্যায় ভালোবেসে থাকে। অপরদিকে যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসা সুদৃঢ়'**। (সুরা আল-বাকারাহ-১৬৫)।

যে ইবাদাতের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা আমাদের সৃষ্টি করেছেন, সেটি ভালাবাসার সর্বোচ্চ স্তর। তাওহীদের রুহ হলো: আল্লাহ তা'আলাকে নিরঙ্কুশ ভালোবাসা। এটিই হলো ইবাদাত হাকিকাত। রবের প্রতি বান্দার ভালোবাসা পূর্ণতা না পেলে এবং সব ভালোবাসার উপর তাঁর ভালোবাসাকে স্থান না দিলে, তাওহীদ অসম্পন্ন রয়ে যাবে। অন্যান্য ভালোবাসা রবের ভালোসার অনুগামী হবে। অন্যগুলোর উপর এটি প্রভাব বিস্তার করবে। রবের প্রতি নিরঙ্কুশ ভালোবাসার উপর বান্দার সৌভাগ্য ও সফলতা নির্ভর করে।

ঈমান ভিত্তিক এই ভালোবাসা সন্তানদের আচার-ব্যবহার শুধরানো, দ্বীন ইসলামের উপর তাদের সুসংহত রাখা, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্যের পথে সচল রাখার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। যার অন্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসার বীজ বপন করা হয়েছে, সে আক্বিদা-বিশ্বাসে, ইবাদাতে আখালাকে সঠিক পথের অধিকারী হবে। দ্বীনের কিছু শাখাগত মাসআলাতে সে যতই পদচ্যুত হোক না কেন, অন্তরের গভীরে রোপিত আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা তাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনবেই, বি ইযনিল্লাহ। কারণ ভালোবাসার শুধমাত্র বাইরের রূপই নয়, বরং ভিতরের চালিকাশক্তিও রয়েছে।

ইসলামী বিশ্বাস যে দর্শনটি বিশ্ববাসীর জন্য পেশ করে, তার স্বতন্ত্র কতগুলো বৈশিষ্ট রয়েছে। যথা: এক. এটি মানব প্রকৃতির সাথে সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ। দুই. সুস্থ্য বিবেক এটিকে প্রত্যাখ্যান করে না বরং গ্রহণ করে। এছাড়াও এটি আরও অনেক স্বতন্ত্র বৈশিষ্টে বৈশিষ্টমন্ডিত। কারণ এতে রয়েছে বুদ্ধিবৃত্তিক, বিশ্বাসগত, মূল্যবোধ এবং শারয়ী বিধানাবলীর পূর্ণাঙ্গ রূপ। বুদ্ধিবৃত্তিক

ও বিশ্বাসগত বিধান হিসেবে এটি বিশ্বভ্রমান্ডের সূচনা-সমাপ্তি এবং এর ভিতরে-বাইরে বিদ্যমান বিষয়াদির সামগ্রিক ব্যাখ্যা দেয়। মানব জীবনের শুরু-শেষের ব্যাখ্যাও স্পষ্ট করে। এরপর পৃথিবী ও মানব জাতির সৃষ্টির উদ্দেশ্যও ঠিক করে দেয়। এর মাধ্যমে ইসলামী বিশ্বাস, মানুষ তার বুদ্ধিবৃত্তিক প্রকৃতির কারণে যেসব প্রশ্ন করে থাকে, সেসব অস্বস্তিকর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেয়। যেসব প্রশ্নের সন্তোষজনক পরিপূর্ণ উত্তর না পেলে সে প্রশান্ত হবে না। বরং সার্বক্ষণিক ফাঁপর ও অস্থিরতায় থাকবে। জীবনের কোন মূল্যই খুঁজে পাবে না।

ঈমানী তারবিয়্যাতের ফলাফল:

শিশুদের ঈমানী প্রতিপালন ঠিকমত সম্পন্ন হলে, তারা বহু মূল্যবান কিছু ফল ভোগ করবে। যথা:

এক. কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী হবে। ফলে সে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের সকল পথ খুঁজতে থ াকবে।

দুই. মনের ভিতরে খারাপ কাজে বাধাদানকারী সুপ্ত সত্তাকে শক্তিশালী করবে। প্রাণবন্ত ঈমান তো সেটিই যা মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

তিন. দুনিয়াকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দেওয়া হতে বিরত থাকবে। ফলে দুনিয়ার সে তার সব গুরুত্বের কেন্দ্রবিন্দু বানাবে না।

চার. ঐশী পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করবে। আল্লাহ তা'আলা মু'মিন বান্দার সকল বিষয়াদির দেখভাল করেন। ফলে তার প্রকৃত কল্যাণ নিশ্চিত হয় আর উভয় জগতের সৌভাগ্য অর্জিত হয়।

পাঁচ. আল্লাহর আনুগত্যের বিষয়ে আগ্রহী হবে। ঈমান যত বৃদ্ধি পাবে, রবের প্রতি বান্দার আস্থা তত শাণিত হবে। তাঁর আনুগত্যের পথে আরও অগ্রগামী হবে। সৃষ্টির মুখাপেক্ষিতা কমে যাবে।

ছয়. নেতিবাচক বাহ্যিক দিকগুলো গোপন থাকবে আর লোকজনের মাঝে সমস্যাও কমে যাবে। অন্তরে ঈমান যত বেশি বৃদ্ধি পাবে, এর উপর প্রবৃত্তির উত্তাপ তত প্রশমিত হবে। মনোবল শক্তিশালী হয়ে চারিত্রিক উন্নত গুণাবলী অর্জনে বান্দাকে ধাবিত করবে।

সাত. মানুষদের মাঝে ইতিবাচক ছাপ রাখবে। শক্তিশালী মু'মিন নিজেকে এবং চারপাশের লোকদের সংশোধনে চেষ্টা অব্যাহত রাখে।

আট. প্রশান্তি অনুভব করবে। মু'মিন হৃদয়ে এই ঈমানী বিশ্বাস সুদৃঢ় হতে থাকলে, সেখান থেকে মানুষের ভয় উধাও হতে থাকবে।

ঈমানী প্রতিপালনের কেন্দ্রসমূহঃ

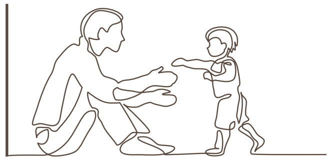

পিতা-মাতার দায়িত্ব সন্তানদের এমন শিক্ষা দেওয়া যা তাদের ঈমান মজবুত করবে, আচার-আচরণ ঠিক করবে, উম্মাতে মুহাম্মাদীর প্রতি নিজেকে সম্পৃক্ত করার অনুভূতি শক্তিশালী করবে। এরুপ আরও অনেক বিষয় রয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম সারির কিছু হলঃ

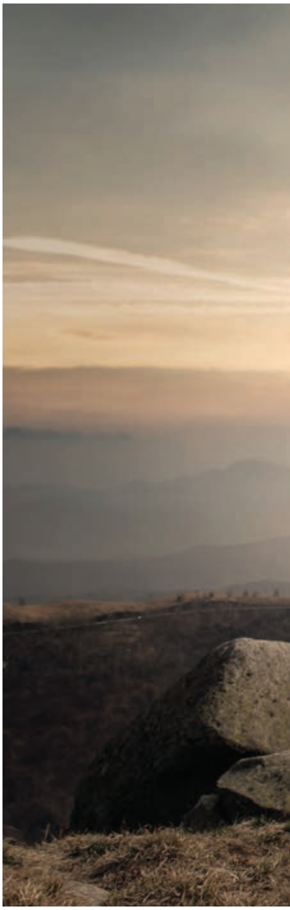

১. ইসলামী শারীয়ার ব্যাপকতা, মানব প্রকৃতির সাথে এর সংগতিসহ ঈমানে মুজমাল এবং ঈমানের রুকন ছয়টি শিক্ষা দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন অন্তসারশূন্যভাবে ঈমানের বাহ্যিক দিকগুলো শুধু শিক্ষা দেওয়া না হয়। শিক্ষাদান যেন প্রায়োগিকভাবে হয়, সে বিষয়ে আগ্রহী হতে হবে। তাহলে অন্তর জেগে উঠবে, ব্রেন আন্দোলিত হবে আর চরিত্র হবে পরিশীলিত।

২. সন্তানরা যেন নাবী ﷺ, তাঁর পরিবারবর্গ, স্ত্রীগন এবং সাহাবীদের প্রকৃতভাবে ভালোবাসে সেই শিক্ষায় গড়ে তুলতে হবে। যে ভালোবাসায় থাকবে না কোন আতিশয্য বা বাড়াবাড়ি আর না থাকবে তাদের মর্যাদাহানি।

৩. সন্তানরা যেন নাবী ﷺ, তাঁর পরিবারবর্গ, স্ত্রীগন এবং সাহাবীদের প্রকৃতভাবে ভালোবাসে সেই শিক্ষায় গড়ে তুলতে হবে। যে ভালোবাসায় থাকবে না কোন আতিশয্য বা বাড়াবাড়ি আর না থাকবে তাদের মর্যাদাহানি।

৪. সৎ কর্ম ছাড়া ঈমান পূর্ণতা পায় না, ভালো কাজের মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধি পায় আর কমতে থাকে মন্দ কাজের মাধ্যমে- এসব বিষয়ের কার্যকরী শিক্ষা দিতে হবে। ঈমানী লালন-পালন সঠিক হলে, আচার-আচরণ, চারিত্রিক মাধুর্যতা এবং ইবাদত-বন্দেগীতে এর সুফল মিলবে হাতেনাতে।

৫. শিশুদের মানসপটে পরকালের প্রতি বিশ্বাসকে দৃঢ় করতে হবে। কারণ পরকালের প্রতি বিশ্বাস যার যত বেশি মজবুত হবে, সে তত বেশি আল্লাহর নিকটবর্তী হতে পারবে। আর দুর্বল হলে সে আল্লাহর থেকে দূরে সরে যাবে। শেখাতে হবে, দুনিয়ার কৃতকর্ম অনুপাতে পরকালে প্রতিদান নির্ধারিত হবে। ভালো হলে ভালো আর মন্দ হলে মন্দ। ভালো হলে অনন্ত সুখের জান্নাত, আর মন্দ হলে ভয়াবহ জাহান্নাম।

৬. আল্লাহ তা'আলার নজরদারিতার বিষয়টি শিশুর কানে ভালোভাবে জপে দিতে হবে। তারা সার্বক্ষণিক তাঁর পর্যবেক্ষণের আওতায় আছে। তিনি তাদের দেখছেন, তাদের কথা শুনছেন, তাদের কোন কিছু তাঁর নিকট অপ্রকাশিত নেই- এ ধ্রুব সত্য বিষয়গুলো খুব যত্নসহকারে তাদের মনে গেঁথে দিতে হবে মালির মালা গাঁথার মত করে।

৭. 'সে সত্যের উপর আছে'- এ অনুভূতি তার কাছে গভীর করতে হবে। এ চেতনা তাকে প্রবৃত্ত করবে দীনকে শক্তভাবে আকড়ে ধরতে।

ঈমান রোপনের জন্য
লালন-পালন যেভাবে হওয়া চাই:

এই পদ্ধতিগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এক. ভালো-মন্দ যাচাইয়ের বয়সে উপনীত হওয়ার পূর্বের পদ্ধতি। দুই. এই বয়সে পৌঁছার পরের পদ্ধতি।

ভালো-মন্দ যাচাইয়ের বয়সে পদার্পণের পূর্বে শিশুর ঈমানকে সুদৃঢ় করতে সহায়তা করে কতগুলো বিষয়। যথা:

১. তার পরিবেশে শ্রুত আব্দুল্লাহ, আব্দুর রহমান, আব্দুল কারীম টাইপের আব্‌দ-যুক্ত নামগুলোর পর্যালোচনা করতে হবে। তার সামনে সংক্ষেপে তুলে ধরতে হবে এর অর্থগুলো। আযান শ্রবণে গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষা দেওয়া চাই দৈনন্দিন দোয়া-যিকিরগুলো। নিজেদের এগুলোর প্রতি ঠিকমত আমাল করতে হবে। তার উপস্থিতিতে স্বশব্দে এগুলো পাঠ করা অত্যন্ত জরুরী। তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে, আল্লাহ তার প্রতি কত নিয়ামত করেছেন। যে কাজগুলো বারবার করা হয়, সেগুলোর আগে পরে পঠিত দোয়া শিক্ষা দিতে হবে। যেমন: খাবারের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলা, শেষে 'আলহামদু লিল্লাহ' বলা ইত্যাদি।

২. কুরআনের কিছু সুরা মুখস্থ করাতে হবে। তাকে বুঝাতে হবে এর মাহাত্ম। কারণ এটি আল্লাহর কালাম। প্রথমে তাকে ইখলাস, নাস, ফালাক এর মত ছোট ছোট সুরাগুলো হিফয করাতে হবে। ঈমানের সঠিক অর্থবহ শিশু বান্ধব কিছু কবিতা ও নাশিদ শেখানো যেতে পারে।

৩. আনন্দঘন ও প্রিয় মুহূর্তগুলোতে অবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ আল্লাহর নামগুলো শিশুর সামনে উল্লেখ করতে হবে। এর মাধ্যমে এগুলোর গুরুত্ব শেখাতে হবে। শৈশবে রুঢ়তা বা শাস্তি দানের সময় আল্লাহর নাম উল্লেখ করা যাবে না। লক্ষ্য রাখতে হবে, আল্লাহর গযব, আযাব বা জাহান্নামের কথা যেন বেশি বেশি তার সামনে আলোচিত না হয়।

৪. সৃষ্টি, শক্তি ও বন্ধনের সৌন্দর্যের প্রতি শিশুর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। তাহলে সে আল্লহর মাহাত্ম ও ক্ষমতার পরিধি অনুধাবন করতে পারবে। এতে রবের প্রতি তার ভালোবাসা বহুগুণে বর্ধিত হবে। কারণ তিনি তাকে ভালোবাসেন। তাঁর সমগ্র সৃষ্টিজগতকে বান্দার জন্য নিয়োজিত করেছেন।

৫. শিশুকে চারিত্রিক শিষ্টাচারের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। সৃষ্টিজগতের প্রতি যেন রহমদিল হয়, তাদের প্রতি তার সহযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে উঠে এবং কথা বলা ও শুনার শিষ্টাচারগুলো যেন আয়ত্ত করে- এসব বিষয়ে তাকে অভ্যস্ত করাতে হবে। উত্তম আদর্শের মাধ্যমে ইসলামী নৈতিকতার বীজ বপন করতে হবে। যা তাকে উন্নত পরিবেশে বসবাসের সুযোগ করে দিবে। ফলে চারপাশের লোকেরা তার থেকে যাবতীয় কল্যাণ গ্রহণ করতে পারবে।

তবে ভালো-মন্দ যাচাইয়ের বয়সে উপনীত হলে, চিন্তা উদ্দীপক কিছু বাড়তি পদ্ধতি আগেরগুলোর সাথে যোগ করতে হবে। যেমন:

১. কত বিশাল এই পৃথিবী! কত সূক্ষ্ম এর সৃষ্টিশৈলী! কত নিপুণ এর কারুকাজ- রবের সৃষ্টির অপূর্ব রূপ শিশুর সামনে তুলে ধরতে হবে। তাহলে সৃষ্টিকর্তার সম্মান ও মর্যাদা তার মনের মণিকোঠায় ঠাঁই করে নিবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: **'এটা আল্লাহরই সৃষ্টি নৈপুণ্য, যিনি সমস্ত কিছুকে করেছেন সুষম'**। (সুরা আন-নামল-৮৮)।

২. আল্লাহ তা'আলার প্রতিটি সৃষ্টিকর্মের অন্তরালে রয়েছে পরিপূর্ণ হিকমাত। তাঁর সব সৃষ্টিই উদ্দেশিত। কোন কিছুই অনর্থক নয়; যদিও আমাদের নিকট সব উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয় না- এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা শিশুকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। তাহলে তার অন্তরে রবের ভালোবাসা তৈরী হবে। মুখে উচ্চারিত হবে তাঁর প্রশংসাগীতি। উদাহরণ দেয়া যেতে পারে দিবা-রাত্রি, সূর্য-চন্দ্র এবং পঞ্চইন্দ্রিয় সৃষ্টির পশ্চাতে যে উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে সেটি উল্লেখ করে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিজগত নিয়ে চিন্তা-ভাবনার আহ্বান জানিয়েছেন অসংখ্য জায়গায়। সুরা রুমে তিনি বলেন: **'তারা কি নিজেদের অন্তরে ভেবে দেখে না যে, আল্লাহ আসমান, যমীন এবং এতোদুভয়ের মধ্যবর্তী যা কিছু আছে তা সবই সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে'**। (সুরা আর-রুম-৮)

৩. চলতি ঘটনাবলীর মাধ্যমে শিশুকে নির্দেশনা দেওয়ার যাবতীয় সুযোগ কাজে লাগাতে হবে খুব বিচক্ষণতার সাথে। যাতে কল্যাণকর কাজে সে অগ্রগামী হয় আর অকল্যাণজনক বিষয় থেকে হয় বিরত। উদাহরণস্বরূপ: শিশু অসুস্থ হলে তার অন্তরকে আল্লাহর সাথে জুড়ে দিবো। তাকে দু'আ শেখাবো। আল্লাহর প্রতি উত্তম ধারণা পোষণের দারস দিবো। শারয়ী ঝাঁড়-ফুকের দীক্ষা দিবো। তার পছন্দের ফল বা মিষ্টান্ন দিবার সময় বলবো: বৎস! এই নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে হবে। তাকে জানিয়ে দিবো, এই নিয়ামতরাজি আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে। তবে কোন দুর্ঘটনাকালে শিশুকে ঈমানী বিষয়গুলো শিক্ষা দেওয়া হতে অভিভাবকদের বিরত থাকা উচিত। কারণ সে এখনও পরিপূর্ণভাবে ভালো-মন্দের মাঝে পার্থক্য নিরুপনে সক্ষম হয়ে উঠে নি।

৪. শিশুকে ইসলামী কোন রীতিতে অভ্যস্ত করাতে চাইলে, অবশ্যই আগে আমাদের সেটি আমল করে দেখাতে হবে। এজন্য একজন অভিভাবকের উচিত, নিজ আচরণের মাধ্যমে অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করা। আচার-ব্যবহারের মাধ্যমে, দ্বীন এবং চারিত্রিক মূল্যবোধের মাঝে সংযোগ আমাদের লালন-পালনকে আন্তরিক ও বাস্তবিক লালন-পালনে পরিণত করবে।

৫. কাঙ্ক্ষিত বিষয়গুলোর যোগান দেওয়া এবং অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় হতে শিশুকে দূরে রাখার জন্য উদ্দেশ্যমূলক গল্পগুলো কাজে লাগাতে হবে। গল্প উপস্থাপন করতে হবে উদাহরণনির্ভর মর্মস্পর্শী ভঙ্গিতে। সাথে ফুটিয়ে তুলতে হবে গল্পে নিহিত মূল্যবোধগুলো।

বিশুদ্ধ অর্থবহ ইসলামী নাশিদ শুনিয়েও উত্তম চরিত্রের বীজ বপন করা সম্ভব। নাবী চরিত; বিশেষত তাঁর শৈশবের কাহিনীগুলো তুলে ধরে নাবীর সাথে শিশুর পরিচিয় ঘটাতে হবে। যাতে সে নাবী প্রেমে পড়ে তাঁর অনুগত হয়। শিশুদের সাথে ঘটে যাওয়া তাঁর গল্পগুলো, তাদের সাথে তাঁর কোমল আচরণ এবং তাঁর উন্নত চারিত্রিক ঘটনাবলী বর্ণনা করলে খুব সহজে সে নাবীর পরিচয় পেয়ে যাবে। এমনিভাবে সাহাবী, উম্মুল মু'মিনীন এবং আহলে বায়তের সদস্যদের গল্পগুলোও শিশুকে শুনাতে হবে।

৬. শিশুর দ্বীনি লালন-পালনে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে হবে। সাধ্যের বাইরে তার উপর কোন কিছু চাপিয়ে দেয়া যাবে না। স্মরণ রাখতে হবে, খেলাধুলা এবং আনন্দ-উল্লাস শিশুর আসল জগত। তার স্বাভাবিক এবং মানসিক বিকাশকে ব্যাহত করে এমন কোন কিছুতে তাকে বাধ্য করা যাবে না। যেমনঃ দায়িত্বের বোঝা চাপানো ও শৈশবের মৌলিক প্রয়োজন হতে বঞ্চিত করে এমন অসংখ্য নিয়ন্ত্রণের বেড়ি পরানো, ইত্যাদি। কারণ এক্ষেত্রে অধিক বাড়াবাড়ি এবং অতিরিক্ত সমালোচনা নেতিবাচক প্রভাব বয়ে আনবে। তার ভেতর সঞ্চার করবে অপরাধ বোধের। সচারচর প্রথম সন্তানের সাথে এমনটি ঘটে থাকে। কারণ কিছু বাবা সন্তানকে পূর্ণ মডেল বানাতে অতি উৎসাহী হয়ে উঠে।

৭. শিশুকে তার স্বাভাবিক প্রকৃতির উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত। বড়দের থেকে ধারাবাহিক হস্তক্ষেপ কাম্য নয়। তার জন্য এমন কিছু কাজ প্রস্তুত করতে হবে, যা তাকে নিজের সক্ষমতা উদ্ঘাটন এবং চারপাশের পরিবেশ বুঝার সুযোগ করে দিবে। এতে অজানাকে জানা এবং দক্ষতা বাড়ানোর ইচ্ছাশক্তির বিকাশ ঘটবে।

৮. উৎসাহদান শিশুর মধ্যে ভালো প্রভাব ফেলে এবং পছন্দের কাজ সম্পাদনে নিজের সবটুকু নিংড়ে দিতে প্রণোদনা দেয়। শিশুর আচরণ নিয়ন্ত্রণ এবং নির্দেশনাদানের ভিত্তি যদি হয় ভালোবাসা এবং প্রতিদান, তাহলে এটি তাকে উত্তম পদ্ধতিতে সঠিক আচরণ অর্জনে সহায়তা করবে। নিজ অধিকারগুলো জানতে শিশুকে সাহায্য করা জরুরী। তাহলে সে বুঝতে পারবে, কোনটি তার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে আর কোনটি এর পর্যায়ভুক্ত নয়। কোন কাজটি করা সঠিক আর কোনটি বেঠিক। মানুষ হিসেবে তার মর্যাদাএবং অবস্থান কতটুকু তাও শিশুকে অবহিত করতে হবে।

৯. সহজ ও আকর্ষণীয় পন্থায় শিশু মননে কুরআনুল কারীমের মর্যাদাস্থাপন করতে হবে। যাতে সে অনুধাবন করতে পারে এর পবিত্রতার বিষয়টি। বুঝতে সক্ষম হয় এর আদেশগুলো আঁকড়ে ধরার গুরুত্ব। শিশু জানবে, তিলাওয়াত ভালো হলে সে পূণ্যবান ফিরিশতাদেরস্তরে পৌঁছে যাবে। শুরুতে ‘আউযু বিল্লাহ’ ‘বিসমিল্লাহ’ বলা, মুসহাফকে সম্মান করা, সুন্দরভাবে মনোযোগ দিয়ে তিলাওয়াত শ্রবণ করা সহ তিলাওয়াতের যাবতীয় আদব রক্ষায় আগ্রহী হবে। শিশুকে কুরআনের আয়াত শ্রবণে অভ্যস্ত করাবো। তাহলে এটি তার ভাষাদক্ষতা বাড়াবে এবং পড়ার প্রতি অধিক আগ্রহী করে তুলবে। ফাতিহা, ইখলাস, ফালাক্ব বা নাসের মত মুখস্ত সুরাগুলোর মধ্য হতে আক্বিদার গুঢ় অর্থবাহী কিছু আয়াতের তাফসীর শিশুর সামনে উপস্থাপন করা যেতে পারে। কুরআনে বর্ণিত ঘটনাগুলো আমরা বারবার ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে তার সামনে তুলে ধরবো বোধগম্য ও সহজ পদ্ধতিতে।

১০. শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে। লক্ষ্য রাখতে হবে, যে তথ্যগুলো তাকে দিতে চাই, প্রশ্নগুলো যেন সেই তথ্য সম্বলিত হয়। আর উত্তর হতে হবে তার বয়স বুঝের স্তরের সাথে সংগতি রেখে খুবই সংক্ষিপ্ত বাক্যে। শিশুর মূল্যবোধের বিকাশ, প্রশংসনীয় চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন এবং আচার-ব্যবহারকে আরও পরিশীলিত করার ক্ষেত্রে এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে।

১১. শিশুকে শরীয়ত অনুমোদিত চিত্র অঙ্কন করে আনন্দ দানের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে উদ্দেশিত চিত্রটিতে যেন ঈমানের রুহ থাকে। চিত্রের ধরনটি যেন প্রতিবার পরিবর্তন করা হয়। আবার প্রতিযোগিতার আয়োজন করেও শিশু শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়। এর ক্ষেত্র কিন্তু বিস্তর এবং নানামুখী। তবে গতিময় প্রতিযোগিতা হলে ভালো হয়। কারণ এটি শিশুরা ভালোবাসে এবং এতে প্রতিক্রিয়া দেখায়।

১২. শিশুর চিন্তা স্তরের সাথে সংগতিপূর্ণ আক্বিদাসংক্রান্ত কিছু হাদিস বা হাদিসের অংশবিশেষ তার সামনে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে, প্রকাশভঙ্গি যেন হয় সাবলীল এবং সংক্ষেপ। আবার ঈমানী কিছু পরিভাষা বারবার বলার মাধ্যমে তাকে শেখানো সম্ভব। তাহলে দেখা যাবে, এগুলোতে অভ্যস্ত হয়ে আপনা আপনি ব্যবহার শুরু করেছে। যেমন: **تَوَكل عَلى اللهِ, قَدرَ اللهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ, اللهُ عَلى كُل شُيْئٍ قَدِيْر** ইত্যাদি। অভিভাবকের সহায়তায় শিশু তার ক্লাস রুম এবং বেড রুম ঈমানী অর্থবাহী বিভিন্ন বাক্য দিয়ে সাজাতে পারে। যেমন: أَنَا مُسْلِمٌ, أَنَا أُحِبُ رَبِيْ, أَرْكَانُ الْإِيْمَانِ, أَنَا أُحِب النَبِي ইত্যাদি। এই শিক্ষা মাধ্যমগুলো ব্যবহার করলে শিশুর মস্তিষ্কে তা গেঁথে যাবে।

১৩. সবাই বিপদগ্রস্ত হয়। কেউ বিপদমুক্ত নয়। দুনিয়ার সবাইকে আল্লাহ তা‘আলা বিপদ-বালা দিয়ে পরীক্ষা করে থাকেন। তাঁর প্রতিটি ফায়সালার পিছনে রয়েছে পরিপূর্ণ হিকমত- এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সবক শিশুকে দিতে হবে। তার মধ্যে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করতে হবে যে, ভালো-মন্দের একমাত্র মালিক আল্লাহ তা‘আলা। তাঁর ক্রোধের চেয়ে রহমত অনেক গুণে বেশি। বিপদের পরেই আসে মুক্তির অনাবিল শান্তি। এটাই প্রাচীন নিয়ম। আল্লাহর প্রতি উত্তম ধারণা পোষণের বিষয়টি তার নিকট গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে হবে। কারণ এগুলো সবই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। আমাদের নিজেদের পছন্দের চেয়ে আমাদের জন্য রবের পছন্দ অধিক উত্তম- এ বিষয়টির প্রতিও তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। মানুষের কর্তব্য, ধৈর্যধারণ করা এবং মুসিবতকালে শারয়ী মাধ্যমগুলো গ্রহণ করা। তারপর যা ঘটে তাতে সন্তুষ্ট থাকা এবং সওয়াবের প্রত্যাশা করা। পরিশেষে তাকে দোয়াতে অধিক মনোযোগী হতে বলবো। কারণ এটি সর্বদা বান্দার লাভজনক ব্যবসা।

শিশুর ঈমানী প্রতিপালনের যতসব মাধ্যমঃ

শিশুর অন্তরে ঈমান রোপনে সহায়ক, প্রতিপালনের অন্যতম কিছু মাধ্যম এখানে আমরা আলোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ।

১. **রোল মডেল বা উত্তম আদর্শঃ** আদর্শ উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রতিপালন এমন একটি পদ্ধতি যা শিশু মননে গভীর দাগ কাটে। তার উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। নাবী ﷺ শৈশবকালে আদর্শের গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আমের রাযিঃ জানাচ্ছেন, **'একদিন আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের ঘরে বসা অবস্থায় আমার মা আমকে ডেকে বললেন, এই যে, এসো! তোমাকে দিবো। আল্লাহর রাসূল ﷺ মাকে প্রশ্ন করলেনঃ তাকে কি দেয়ার ইচ্ছা করেছ? তিনি বললেঃ খেজুর। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে বললেনঃ যদি তুমি তাকে কিছু না দিতে তাহলে এ কারণে তোমার আমালনামায় একটি মিথ্যা পাপ লিপিবদ্ধ হত'**। (আবু দাউদ, হাদিস নং-৪৯৯১)। মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় এসেছে, **'যে তার শিশুকে বললঃ এদিকে আসো তোমাকে দিব। তারপর তাকে কিছু দিল না। তাহলে তার আমালনামায় এটি একটি মিথ্যা পাপ হিসাবে লিপিবদ্ধ হবে'**। (আহমাদ, হাদিস নং-৯৬২৪)।

তাই, আদর্শের মাধ্যমে প্রতিপালন অত্যন্ত কার্যকর একটি পদ্ধতি। হাদিসে সুনির্দিষ্টভাবে শিশুদের সাথে সত্যবাদিতার গুরুত্বের প্রতি নিদের্শনা এসেছে।

২. **হৃদয়স্পর্শী হিতোপদেশঃ** বিভিন্ন রঙ্গে রঙ্গিন করে উপদেশ দেওয়া যেতে পারে। তা হতে পারে প্রথাগত সরাসরি পদ্ধতিতে। দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের মাধ্যমে। গল্প বলার ফাঁকে ফাঁকে। আলাপচারিতার ছলে বা আরও অন্যান্য রীতিতে। তবে বেশি উপদেশ দিতে গিয়ে শিশু যেন বিরক্ত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা একান্ত জরুরী।

৩. **আগ্রহান্বিতকরণ ও ভীতিপ্রদর্শন:** এটি আবেগপ্রবণ পদ্ধতিগুলোর অন্যতম। কারণ এটি উপকারী জিনিস পছন্দ করা ও তা পেতে চাওয়া কিংবা ক্ষতিকর বিষয় ঘৃণা করা ও তা প্রতিহত করার যে স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য দিয়ে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, সেটিকে সরাসরি ছুঁয়ে যায়। এই পদ্ধতির প্রয়োগ হতে হবে ইনসাফভিত্তিক এবং ন্যায়সংগত। একটু বেশি করা যাবে না বা একটু কমও করা যাবে না। শিশুরা সাধারণত সংবেদনশীল হৃদয়ের অধিকারী হয়ে থাকে। তাই তাদের আতঙ্কিত করা মোটেও কাম্য নয়। তাতে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। বরং বেশি বেশি আশান্বিত করা চাই। এ বয়সী শিশুদের প্রয়োজন বেশি বেশি আশা জাগিয়ে তোলা, ভয় দেখানো নয়।

৪. **প্রশিক্ষণ, অভ্যস্তকরণ ও অনুশীলন:** রবের সন্তুষ্টি, ভীতি ও শরম, সর্বক্ষণ তাঁর উপর নির্ভর করা, সব বিষয় তাঁর হাতে ন্যস্ত করা - শিশুকে এসব বিষয়ে আগ্রহী করে গড়ে তুললে যে কোন বিপদে টিকে থাকার শক্তি পাবে। আর পেয়ে যাবে আত্মপ্রশান্তিকর দৃঢ় বিশ্বাস।

৫. **পুনরাবৃত্তি ও পৌনঃপোনিকতা:** শিক্ষাক্ষেত্রে এবং মানব মনে জ্ঞান দৃঢ়করণে এই পদ্ধতি দুটির উপকারিতা নিশ্চিত করেছে আধুনিক বিজ্ঞান ও লব্ধ অভিজ্ঞতা।

৬. **আলাপচারিতা ও প্রশ্নোত্তর:** শিশুর সাথে আলাপচারিতায় তার জানার পরিধি বিস্তৃত হয়। তার সামনে জ্ঞানের নতুন নতুন দিগন্ত খুলে যায়। তবে এক্ষেত্রে কিছু বিষয় লক্ষ্য রাখা অত্যন্ত জরুরী। যেমন: শিশুর মতামতকে সাদর সম্ভাষণ জানানো, তার ব্যক্তিত্বকে খাটো না করা, তার মুগ্ধ শ্রোতা বনে যাওয়া এবং শান্ত পরিবেশে ধীরস্থিরতার সাথে আলোচনা করা ইত্যাদি। তাহলেই এ আলাপচারিতা শিশুর সাথে ফলপ্রসূ ও কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হবে। আবার এর মাধ্যমে শিশুর প্রতিপালন এবং তাকে নির্দেশনা দেওয়া সম্ভব হবে।

৭. **কিতাব (পুস্তক/বই):** পারিবারিক পাঠাগারের গুরুত্ব অপরিসীম। যেখানে সমাহার ঘটবে বিভিন্ন ধরনের উপকারী বইয়ের। শিশু সেখানে ডুব দিয়ে মেটাবে জ্ঞানের তৃষ্ণা। হবে সংস্কৃতবান। শাণিত হবে তার ঈমানের ধার। পাঠাগারে বইয়ের সফটকপি হার্ডকপি, অডিও-ভিডিওর সংমিশ্রণ থাকাটা অত্যন্ত কার্যকর হবে। এখানে একগাদা গল্প ও জীবনী গ্রন্থ থাকা বাঞ্ছনীয়। কারণ গল্পের মাধ্যমে, গল্প পড়িয়ে শিশুকে কোন কিছু শিক্ষা দেওয়া সহজ। নাবী ﷺ ও সহাবা চরিতে বহু ঘটনা রয়েছে যেখান থেকে শিশু শিক্ষার অগাধ রসদ সংগ্রহ করা যেতে পারে।

৮. **শিক্ষাদানে আধুনিক টেকনোলজি :** শিক্ষাদানে সহায়ক আধুনিক টেকনোলজির অনেক উপকরণ রয়েছে। এগুলো বিভিন্ন চিন্তা-চেতনা ছড়িয়ে দিতে বিরাট ভূমিকা পালন করে। সেগুলোকে শিশুর মনোগ্রাহী করে তার মধ্যে বদ্ধমূল করে দেয়। ফলে সে খুব সহজে এগুলো বুঝতে পারে। নিগুঢ় জট খুলতে সক্ষম হয়। কারণ টেকনোলজির সহায়তায় এই ফিকির ও মূলনীতিগুলো চিত্তাকর্ষক মোড়কে উপস্থাপন করা হয়- যা খুব সহজে শিশুর মনোযোগ আকর্ষণ করে। সেটি গ্রহনে তাকে স্বতুঃস্ফুর্ত করে তোলে।

৯. **স্বভাবজাত ঝোঁক বা প্রবণতা:** শিশুর স্বভাবজাত অনেক ঝোঁক রয়েছে। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সেগুলো কাজে লাগানো যেতে পারে। যেমনঃ খেলাধুলা করা, অন্যকে সহায়তার মনোভাব, অপরকে অনুসরণ করার প্রবণতা ইত্যাদি। খেলাধুলার মাধ্যমে শিশু তার চারপাশের জগতকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়। তার চিন্তা-ভাবনা আর অনুভূতির মাত্রা অন্যের নিকট ব্যক্ত করতে পারে। এটি কাজে লাগিয়ে জীবন জগত সম্পর্কে বিশুদ্ধ ধারণা তার সামনে তুলে ধরতে হবে। রোপন করতে হবে তার মননে দীনী মূল্যবোধগুলো। তবে অবশ্যই তা হতে হবে সহজ, সাবলীল ও উপযুক্ত পদ্ধতিতে।

১০. **দু'আ:** রবের প্রতি বান্দা মুখাপেক্ষী, তাঁকে বান্দার প্রয়োজন এবং তাঁর অনুগ্রহের প্রতীক্ষায় অধীর আগ্রহে ধ্যানে বসা- এই বাহ্যিকতাগুলো দু'আর মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে দু'আ করতে অনুপ্রাণিত করেছেন। সাথে দিয়েছেন দু'আ কবুলের প্রতিশ্রুতি। এটি তিনি তাঁর কালামে পাকে আমাদেরকে জানিয়েছেন এইভাবে: **'তোমাদের প্রতিপালক বলেনঃ তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব'**। (সুরা গাফির, আয়াত নং-৬০)।

সন্তান প্রতিপালনের চুড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছাতে অভিভাবকের এক অনন্য হাতিয়ার হলো দু'আ। পৃথিবীর সবচে' মহান অভিভাবক নাবী-রাসূলগণ ঈমান ও তাওহীদের উপর অটল থাকার অভিপ্রায়ে এই হাতিয়ার ব্যবহার করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের সেই আকুতি-মিনতিপূর্ণ আবেদনগুলো কুরআনে কোড করেছেন: **'স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম (তার দু'আতে) বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! এ নগরীকে নিরাপদ কর এবং আমাকে ও আমার পুত্রগণকে প্রতিমা পূজা হতে দূরে রাখ'**। (সুরা ইবরাহীম, আয়াত নং-৩৫)।

১১. **উদাহরণ ও অনুকরণ:** স্বভাবজাতভাবেই শিশু অনুকরণ করতে ভালোবাসে। সে মসজিদে ইমামকে সলাত আদায় করাতে দেখে। অবলোকন করে মিম্বারে খতীবের খুতবা। গভীর পর্যবেক্ষণ করে ক্লাসে শিক্ষকের পাঠদানকে। আমরা তাকে তার দেখা এসব বিষয় অনুকরণের সুযোগ করে দিতে পারি- মসজিদের ইমামের ভুমিকায় সলাত আদায় করানো, মিম্বারে খতীব বনে খুতবা দান বা ক্লাসে শিক্ষকের আসনে পাঠদান ইত্যাদি। তাহলে এ পেশাগুলোর তাৎপর্য তার নিকট সুদৃঢ় হবে। আর এ স্থানগুলোর মর্যাদা হবে তার কাছে সংরক্ষিত। অভিভাবক অভিভাবক

অভিভাবকের যেসব গুণ থাকা চাই:

১. করুণা ও দয়া: কোমল আচরণ মিশ্রিত করুণা দিয়ে শিশুর হৃদয় জয় করতে হবে। অন্যথায় প্রতিপালনের ভালো ফল পাওয়া দূরহ হয়ে উঠবে। কোমল আচরণ ও দয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। চলুন না! আকরা বিন হাবিস রাযি: এর নিকট থেকে এ সংক্রান্ত একটি ঘটনা শুনি। তিনি বলেন: একদিন দেখি, নাবী ﷺ হাসান হুসাইন রাযি: এর কপলে চুমু এঁকে দিচ্ছেন। এ দৃশ্য দেখে তো আমি ভীষণ অবাক! বললাম: হে আল্লাহর রাসূল ﷺ, আমি দশ সন্তানের জনক। কিন্তু কখনও তাদের কাউকেই চুমু দেই নি। জবাবে দয়ার নাবী ﷺ দুটি মূলনীতি শুনালেন: **'যে দয়া করে না, সে দয়া পায় না'**। (সহীহুল বুখারী, হাদিস নং-৫৯৯৭)। **'দয়াশীলদের উপর করুণাময় আল্লাহ দয়া করেন। তোমরা দুনিয়াবাসীকে দয়া করো, তাহলে যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের দয়া করবেন'**। (আবু দাউদ, হাদিস নং-৪৯৪১)।

২. সহনশীলতা ও ক্ষমা: আমাদের নেতা নাবী ﷺ সহনশীলতা নামক এই চরিত্রের চূড়ায় আরোহণ করেছেন। আসুন তো! নাবী চরিতে একটু ডুব দেই। সেখান থেকে মণি-মুক্তা আহরণ করার চেষ্টা করি। আনাস রাযি: জানাচ্ছেন: **'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে পথ চলছিলাম। তাঁর গায়ে ছিল মোটা পাড়বিশিষ্ট নাজরানী চাদর। জনৈক বেদুঈন তাঁর কাছে এসে তাঁর চাদরটি ধরে জোরে টান দিল। আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, আমি লক্ষ্য করলাম, সজোরে টানার কারণে নাবী ﷺ এর কাঁধের উপর চাদরের পাড়ের ছাপ পড়ে গেছে। বেদুঈন বললো, হে মুহাম্মাদ ﷺ! আল্লাহ্‌র যেসব অর্থ-সম্পদ আপনার কাছে আছে, তা থেকে আমাকে কিছু দেয়ার আদেশ দিন। নাবী ﷺ তার দিকে তাকিয়ে হাসলেন এবং তাকে কিছু দেয়ার নির্দেশ দিলেন'**। (সহীহুল বুখারী, হাদিস নং-৫৮০৯)।

ক্ষমা সহনশীলতার পর্যায়ভুক্ত একটি বিষয়। রবের কালাম হতে এর ইঙ্গিত পাওয়া যায়: **'তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন কর, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদেরকে এড়িয়ে চল'**। (সুরা আল-আ'রাফ, আয়াত নং-১৯৯)।

নাবী ﷺ ক্রোধ নিবারণে প্রণোদনা দিয়েছেন। রাগ করতে বারণও করেছেন। যেন সহনশীলতার গুণ অর্জিত হয়। জনৈক বেদুইনকে তিনি এ উপদেশই দিয়েছেন: **'ক্রোধান্বিত হয়ো না। লোকটি বারবার তার অনুরোধের পুনরাবৃত্তি করলে নাবী ﷺ-ও প্রতিবারই বলতে থাকলেন : ক্রোধান্বিত হয়ো না'**। (সহীহুল বুখারী, হাদিস নং-৬১১৬)।

একজন অভিভাবককে তাই সহনশীলতা ও ক্ষমার অনুপম গুণে গুণান্বিত হতে হবে।

৩. **ধৈর্য:** সন্তান প্রতিপালন বা শিক্ষাদানের সময় অভিভাবককে আবশ্যই ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে। কোন অবস্থায় তাড়াহুড়া করা যাবে না। উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন বা ফলাফল পেতেও অভিভাবকর তরিৎ ভাব পরিহার করতে হবে। অন্যথায় তাকে নৈরাশ্যভাব পেয়ে বসবে। নিজেকে ব্যর্থ মনে হবে। অধৈর্য অভিভাবক রসদহীন মুসাফিরের মত। মুসাফির যেমন রসদ ছাড়া গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে না, অভিভাবক তেমনি ধৈর্যহারা হলে অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হতে ব্যর্থ হবে।

৪. **ন্যায্যতা:** সুস্পষ্ট কোন কারণ ছাড়া সন্তানদের একজনের উপর অন্যজনকে অগ্রাধিকার দেওয়া যাবে না। অন্যথায় তাদের মাঝে ঐক্যের মজবুত প্রাসাদে ফাঁটল ধরবে। ধোয়ার কুণ্ডলীর মত বিদ্বেষের বিষবাষ্প ছড়িয়ে পড়বে। দেখা দিবে মিশ্র প্রক্রিয়া। বস্তুত: কোন কিছুতে যুলুমের ছোয়া লাগলে তা কদর্য ভাব পরিগ্রহ করবে- এটাই স্বাভাবিক।

৫. **বিশ্বস্ততা:** সন্তানদের সাথে আচরণে অভিভাবককে অবশ্যই আন্তরিক ও বিশ্বস্ত হতে হবে। বিশ্বস্ততা নাবী-রাসূলদের বৈশিষ্ট। বিশ্বস্ত না হলে কোন কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করা আদৌও সম্ভব নয়। নিজ উদ্দেশ্য সাধনও সুদূর পরাহত হয়ে দাঁড়াবে।

৬. **আল্লাহভীরুতা:** যে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করবে তাওফীক নামক নিয়ামতের বৃষ্টি তার উপর অবিরত ঝরতে থাকবে। এটি তার কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যাবে। তাওফীক, সফলতা, সঠিকতা আর দুনিয়া আখিরাতে কৃতকার্যতা তাকওয়ার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। তাই আল্লাহভীরুতার গুণ না থাকলে, শিশু লালন-পালন পূর্ণতা পাবে না।

৭. **একনিষ্ঠতা:** শরীর যেমন হৃদপিন্ড ছাড়া অচল, ইখলাস বিহীন সৎ কাজও তেমনি অচল। প্রতিটি ভালো কাজ একমাত্র আল্লাহর জন্য হওয়া চাই। না হলে, তা প্রত্যাখ্যাত হবে। সকল কষ্ট পন্ডশ্রম হবে। তাই শিশু প্রতিপালনে একনিষ্ঠতা থাকা চাই-ই চাই।

৮. **ইলম বা জ্ঞান:** জ্ঞানীরাই বর্তমান ও শেষ পরিণতি সম্পর্কে দূরদর্শী হয়ে থাকে। অপরপক্ষে, মূর্খরা বর্তমানকে হেলায় নষ্ট করে। শেষ পরিণতিতে হয় ক্ষতিগ্রস্ত। তাই অভিভাবককে অবশ্যই বর্তমান ও ফলাফলের বিষয়ে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হতে হবে।

৯. **প্রজ্ঞা:** অভিভাবককে প্রতিটি বিষয় যথাস্থানে প্রয়োগ করতে হবে। তবেই বিষয়গুলোর সুফল পাবে। সন্তান লালন-পালন হবে ফলপ্রসূ । অভিভাবকের দায়িত্ব, হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করা এবং শিশুকে নির্দেশনা প্রদানে তা কাজে লাগানো।

১০. **প্রতিপালনমূলক কর্মের প্রতি বিশ্বাস রাখা:** প্রতিপালন হলো মানসিক ও আত্মিক দান। সুতরাং কেউ প্রতিপালনমূলক কর্মের প্রতি বিশ্বাসী না হলে সে এ ধরণের দান প্রদান করতে সক্ষম হবে না।

১১. **উন্নতি:** গার্ডিয়ানকে অবশ্যই নিজ সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে। অভিভাবক হিসেবে সন্তান লালন-পালনে তার যে ভূমিকা, সেটি পালনে যাতে কাঙ্খিত মানে উপনীত হতে পারেন, সেজন্য নিজের সার্বিক উন্নতি জরুরী একটি বিষয়।

ঈমানী লালন-পালনের স্তম্ভসমূহ

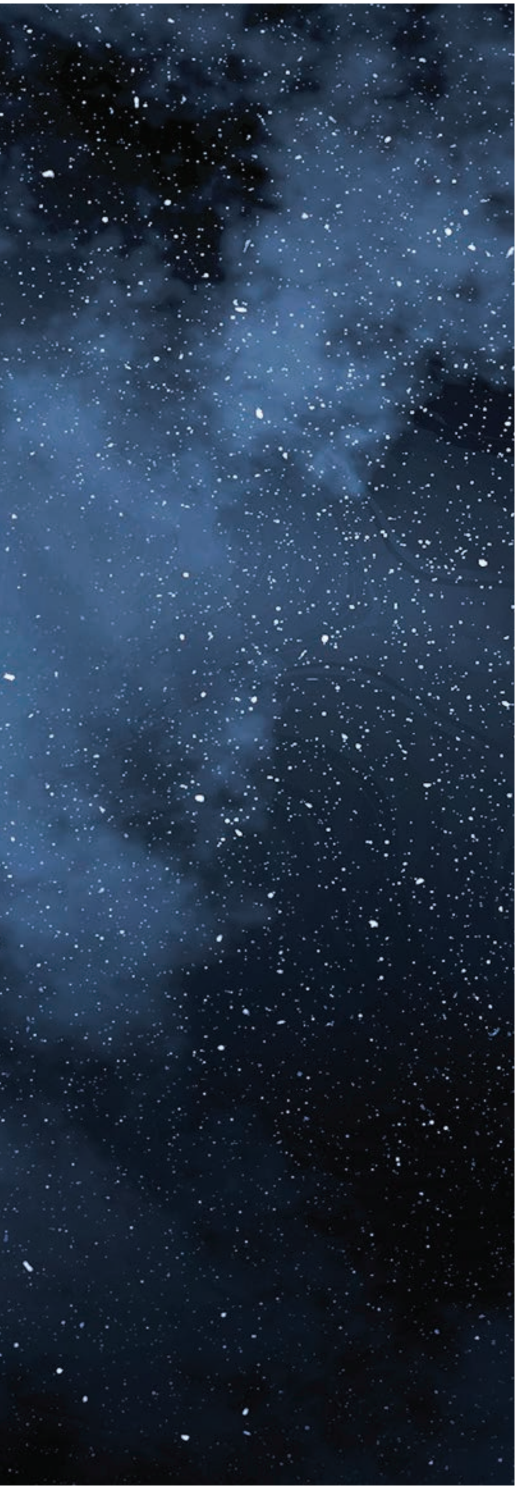

প্রথম স্তম্ভ:

আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস

দ্বিতীয় স্তম্ভ:

ফিতিশতাদের প্রতি বিশ্বাস-

তৃতীয় স্তম্ভ:

আসমানী গ্রন্থসমূহের প্রতি বিশ্বাস

চতুর্থ স্তম্ভ:

রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস-

পঞ্চম স্তম্ভ:

পরকালের প্রতি বিশ্বাস-

ষষ্ঠ স্তম্ভ:

তাকদীরের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস-

প্রথম স্তম্ভ:

আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস

মানবীয় স্বভাব, বিবেক-বুদ্ধি বা রব প্রদত্ত বিধান সবকিছুই আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে। প্রতিটি সৃষ্টিকে রবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। যুক্তি বলছে, এই বিশাল সৃষ্টিজগতের একজন স্রষ্টা থাকতেই হবে। আর প্রতিটি আসমানী জীবন ব্যবস্থাতে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের বিষয়টি স্বীকৃত। আল্লাহর প্রতি ঈমান চারটি বিষয়ের সমষ্টি। যথা: ১. আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন। ২. তাঁর রুবুবিয়্যাহ তথা তিনি দাতা, সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, আসমান-জমিনের পরিচালক- এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন। ৩. তাঁর উলুহিয়্যাহ তথা ইবাদত পাওয়ার যোগ্য একমাত্র তিনি, এতে কাউকেই অংশীদার করা যাবে না- এ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন। এবং ৪. কুরআন-সুন্নাহতে বিবৃত তাঁর উত্তম নাম ও গুণাবলীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন। আমরা খুব যত্ন সহকারে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে শিশুকে এই চারটি বিষয় শেখাবো। তাহলে সে আল্লাহর পরিচয় পেয়ে বেড়ে উঠবে। তাঁর মর্যাদামনের মণিকোঠায় ঠাঁয় করে নিবে। শৈশবেই রবের প্রেমে পড়ে যাবে। এই স্তম্ভটি কিন্তু অবশিষ্ট তিন স্তম্ভের বুনিয়াদ।

শিশুকে আল্লাহর ভালোবাসা শেখাবো কেন?!

১. আল্লাহ তা'আলা আমাদের শূন্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। অবয়বকে করেছেন দৃষ্টিনন্দন। শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন তাঁর বহু সৃষ্টিজীবের উপর। ধন্য করেছেন 'ইসলাম' নামক মহামূল্যবান নিয়ামত দিয়ে। অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও অজস্র অনুগ্রহে করেছের সিক্ত। আবার তিনিই দিয়েছেন জান্নাতের প্রতিশ্রুতি। তাঁর তাওফীকলব্ধ কর্মের প্রতিদান স্বরুপ। আদি অন্তে অনুগ্রহকারী একমাত্র তিনিই।

২. প্রকাশ্য- অপ্রকাশ্য সম্মান বা শ্রদ্ধা আসে ভালোবাসা বা ভালোলাগা থেকেই। রবের সাথে শিশুদের সম্পর্ক গড়ে উঠুক ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার ভিত্তিতে। সম্পর্কটি যেন কেবলমাত্র তাঁর শাস্তি বা জাহান্নামের ভয় কেন্দ্রিক না হয়। বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী। এর ফলাফলও আমরা পাবো হাতেনাতে। শিশুরা রবের ইবাদাত আত্মিকভাবে উপভোগ করবে। তারা মুস্তাকিমের পথ থেকে বিচ্যুত হবে না।

৩. আল্লাহ তা'আলা চিরঞ্জীব, অবিনশ্বর, চিরস্থায়ী মৃত্যু যাকে স্পর্শ করতে পারে না। ঘুম তন্দ্রা যাকে পেয়ে বসে না। তিনি আপন ক্ষমতায় সর্বাবস্থায় বান্দাদের সাথেই থাকেন। তাদের দেখভাল ও রক্ষণাবেক্ষন করেন পিতা-মাতার চেয়েও অধিক নিপুণভাবে। তাই, রবের সাথে তাদেরকে জুড়ে দেওয়া, তাদের মনে রবের ভালোবাসা সৃষ্টি করা জীবনের চেয়ে বেশি জরুরী।

৪. তারা আল্লাহকে ভালোবাসলে তাঁর কালামে পাক তথা কুরআনকেও ভালোবাসবে। সলাত আদায়ে হবে আগ্রহী । যখন জানবে, আল্লাহ তা'আলা সুন্দর, তিনি সুন্দরকে ভালোবসেন। তখন সে প্রতিটি ভালো ও সুন্দরের পূজারী বনে যাবে। যখন জানবে, তিনি তাওবাকারী, পবিত্রতা অর্জনকারী, অনুগ্রহশীল, সাদাকাদাতা, ধৈর্যধারণকারী, তাঁর উপর ভরসাকারী, মুত্তাকীসহ সৎ কাজ সম্পাদনকারী সবাইকে পছন্দ করেন। তখন এই বৈশিষ্টগুলোর রংয়ে রঙ্গিন হতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবে। প্রতিপালকের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য, তাঁর ভালোবাসা পাবার নিমিত্তে আর তাঁর মিত্রতার ছায়ায় আশ্রয় পাবার অভিপ্রায়ে। অপরপক্ষে যখন দেখবে, খিয়ানতকারী কাফির দাম্ভিক সীমালংঘনকারী অত্যাচারী ফাসাদপ্রিয় সহ খারপ কাজের সাথে জড়িত সবাইকে তিনি অপছন্দ করেন। তখন সাধ্যানুযায়ী এইসব গর্হিত কাজ হতে দূরে থাকবে। রবের ভালোবাসার সন্ধানে, তাঁর সন্তোষ পাবার আশায়।

৫. আল্লাহর ভালোবাসা মানেই 'তিনি সর্বদা আমাদের সাথেই আছেন'- এই অনুভূতির পরশ নেওয়া। ফলে হৃদয়ে দোলা দেয় প্রশান্তি, আনন্দ আর অবিচলতার অনাবিল ঢেউ। কেটে যায় অস্থিরতা দুশ্চিন্তার যত সব কালো রেখা। দেহ আত্মার মুক্তি মেলে মানসিক শারীরিক সকল প্রকার ব্যারাম থেকে। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো, পাপ-পঙ্কিলতার নিকশ কালো আঁধার কেটে যায়।

সন্তানদের যেভাবে আল্লাহ প্রেমিক বানাবোঃ

১. শিশুর মধ্যে ঈমান সংক্রান্ত বিষয়াদি বদ্ধমূল করার একমাত্র ফলপ্রসূ পথ তার ইন্দ্রিয়কে নাড়া দেওয়া। স্রষ্টার প্রতি শিশুর বিশ্বাস মজবুত করার জন্য আমাদের নির্ভর করতে হবে তার পঞ্চইন্দ্রিয়ের উপর। সূর্য, বৃষ্টি বা বায়ুর মত তার চারপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীকে আমরা কাজে লাগাবো। 'এই ধরনী পরিচালনার জন্য একজন স্রষ্টা রয়েছে'- এই পরম সত্য মূলনীতিটি এগুলোর মাধ্যমে তাকে শেখাবো। উৎসাহ যোগাবো বেশি বেশি প্রশ্ন করবার জন্য। শিশুদের চোখে ঈমানী চশমা সেট করার চেষ্টা করবো। যাতে জ্ঞানের দিগন্তে পঠিত সব কিছুতে তারা আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ দেখতে পায়। আল্লাহর অলৌকিক ক্ষমতা, বিস্ময়কর সৃষ্টির পর্দা তার সামনে খুলে দিবো। যেমনঃ মানব সৃষ্টির সূচনা পর্যবেক্ষণের ইলাহী নির্দেশনা। তাঁর আহ্বানঃ **'সুতরাং মানুষের লক্ষ্য করা উচিত যে, তাকে কিসের দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে'**। (সুরা আত-ত্বরিক, আয়াত নং-৫)।

'এবং তোমাদের মধ্যেও! তোমরা কি অনুধাবন করবে না?' (সুরা আয-যারিয়াত, আয়াত নং-২১)

মানব খাদ্যের প্রতি দৃষ্টিপাতের ঐশী আদেশ। কিভাবে তিনি এর সূচনা করলেন। খাদ্য সৃষ্টির বিবিধ স্তরও বর্ণনা করলেন। তাঁর ভাষায়ঃ **'মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক'**। (সুরা আবাসা, আয়াত নং-২৪)।

আল্লাহর বড়ত্বের প্রমাণবাহী সৃষ্টিজগতের প্রতি তাকালেও তাঁর অসীম ক্ষমতার পর্দা উন্মোচিত হবে। তাই তো তিনি এগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাতের নির্দেশ দিয়েছেনঃ **'তবে কি তারা উষ্ট্রপালের দিকে লক্ষ্য করে না যে, কিভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে? এবং আকাশের দিকে যে, কিভাবে তাকে সমুচ্চ করা হয়েছে? এবং পর্বতমালার দিকে যে, কিভাবে তাকে স্থাপন করা হয়েছে? এবং যমীনের দিকে যে, কিভাবে তাকে বিছিয়ে দেয়া হয়েছে'?** (সুরা আল-গাশিয়াহ, আয়াত নং-২০-১৭)।

এই বিশাল সৃষ্টিরজগতের তাৎপর্য, সৃষ্টির সৌন্দর্য, স্রষ্টার মাহাত্ম ও সৃজনশীলতা বয়সভেদে শিশুদের মানসপটে খোদাই করে দিতে হবে। এক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হবে বিভিন্ন বিশ্লেষণধর্মী শিক্ষা মাধ্যমসমূহ। সহায়তা নিতে হবে আধুনিক টেকনোলজির। স্বভাবজাতভাবে একজন শিশু, তার জন্য এত আয়োজন যিনি করেছেন, সেই সত্ত্বাকে ভালো না বেসে পারবে না।

২. শিশুকে বলবো: জানো! আল্লাহর না, অসংখ্য সুন্দর সুন্দর নাম ও গুণাবলী রয়েছে। এগুলো বলে দেয়, আমাদের রব মহান আল্লাহ সকল ত্রুটি-বিচ্যুতিমুক্ত পূর্ণাঙ্গ এক সত্ত্বা। তিনি অনন্য সুন্দর। তিনি দয়ার আধার। তাঁর রহমত সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে। তিনি পরম ক্ষমাশীল। সব ভুল-ভ্রান্তি তাঁর ক্ষমার চাদরে ঢাকা। তিনি অসীম ক্ষমাপরায়ণ। বান্দাদের অপরাধগুলো গোপন করার মাধ্যমে তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে থাকেন। তিনি পরম দাতা। না চাইতেই দেন। আবার কোন কারণ ছাড়াই দেন। তিনি মহান পথপ্রদর্শক। বান্দাদের যাবতীয় কল্যাণের পথ বাতলে দেন। তিনি পরম স্নেহপরায়ণ। ভালোবাসার সিন্দুক নিয়ে বসে আছেন। শুধু ভালোবসেন আর ভালোবাসেন। আল্লাহর নামগুলোর পরিচয় পায় যে জনে, তারে ভালো না বেসে সে থাকে কেমনে!!

৩. 'আমার কথা না শুনলে, আমাকে না মান্য করলে আল্লাহ তোমাকে শাস্তি দিবেন' - শিশুদের এ ধরনের বয়ান দেওয়া হতে বিরত থাকা একান্ত জরুরী। আল্লাহর অবাধ্য হলে তিনি শাস্তি দিবেন আর আমাকে মান্য না করলে তিনি সাজা দিবেন- এ দুয়ের মাঝে রয়েছে বিস্তর ফারাক। শিশুকে উভয়টি এক সমান্তরালে রেখে শিক্ষা দেওয়া যাবে না। এটি আপনার শিশুকে রবের ক্ষমতা ও বড়ত্ব নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে বাধা দিবে। আল্লাহর শাস্তির হুমকি-ধুমকিকে শিশু লালন-পালনের মেথড হিসেবে গ্রহণ করা অনুচিত। বরং তার মানসপটে খোদাই করতে হবে আল্লাহর ভালোবাসা, সম্মান ও মর্যাদাকে। শিশুর উপর রেখাপাত করে বলে, সব কিছু আল্লাহর নামে চালিয়ে দেওয়া যাবে না।

৪. বাবা-মাকে সালাতসহ অন্যান্য ফরয ইবাদত পালন বা কোন নিষিদ্ধ বিষয় পরহেজ করতে দেখলে শিশু প্রায়শঃ এর কারণ জানতে চাই। এক্ষেত্রে অবশ্যই বাবা-মায়ের উত্তরজুড়ে থাকতে হবে আল্লাহর ভালোবাসা এবং তাঁর আনুগত্যের প্রসঙ্গ। শিশু বাবা-মাকে আল্লাহর ভালোবাসা লালন করতে দেখবে। ফলে সেও এ ভালোবাসার উপর পলপল করে বেড়ে উঠবে। কারণ; শিশু তো সর্বপ্রথম বাবা-মাকেই অনুকরণ করে। জান্নাত এবং এর অকল্পনীয় নিয়ামতরাজির আলোচনাও শিশুদের মনে রবের ভালোবাসা জন্মাবে।

৫. শিশু আবশ্যকীয় ইবাদাতের মর্ম বুঝার বয়সে উপনীত হলে, তাকে শেখাতে হবে কেন আল্লাহকে ভালোবাসা অত্যন্ত জরুরী। কারণ, আল্লাহ তা'আলা আমাদের সৃষ্টি করেছেন। অবয়বকে করেছেন দৃষ্টিনন্দন। শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন তাঁর অন্য বহু সৃষ্টিজীবের উপর। ধন্য করেছেন 'ইসলাম' নামক মহামূল্যবান নিয়ামত দিয়ে। তাকে শেখাবো, চারপাশের যাবতীয় নিয়ামতরাজি আল্লাহ তা'আলার-ই দান। শেখাবো, কিভাবে প্রাপ্ত নিয়ামতরাজিতে আল্লাহর প্রশংসাগীতি গাইতে হয়? কিভাবে কৃজ্ঞতার বাণী উচ্চরণ করতে হয়? আর কেমনে চাইতে হয় আরও বেশি করে সেই অনুগ্রহরাজি? রবের নিয়ামতের এ পাঠ তাঁকে ভালোবাসতে উদ্ধুদ্ধ করবে সন্দেহাতীতভাবে।

৬. যেসব কথা, কর্ম বা অবস্থা আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের ভালোবাসা বয়ে আনবে, সেসব সহায়ক মাধ্যমগুলো শিশুকে শিক্ষা দিতে হবে খুব গুরুত্বের সাথে।

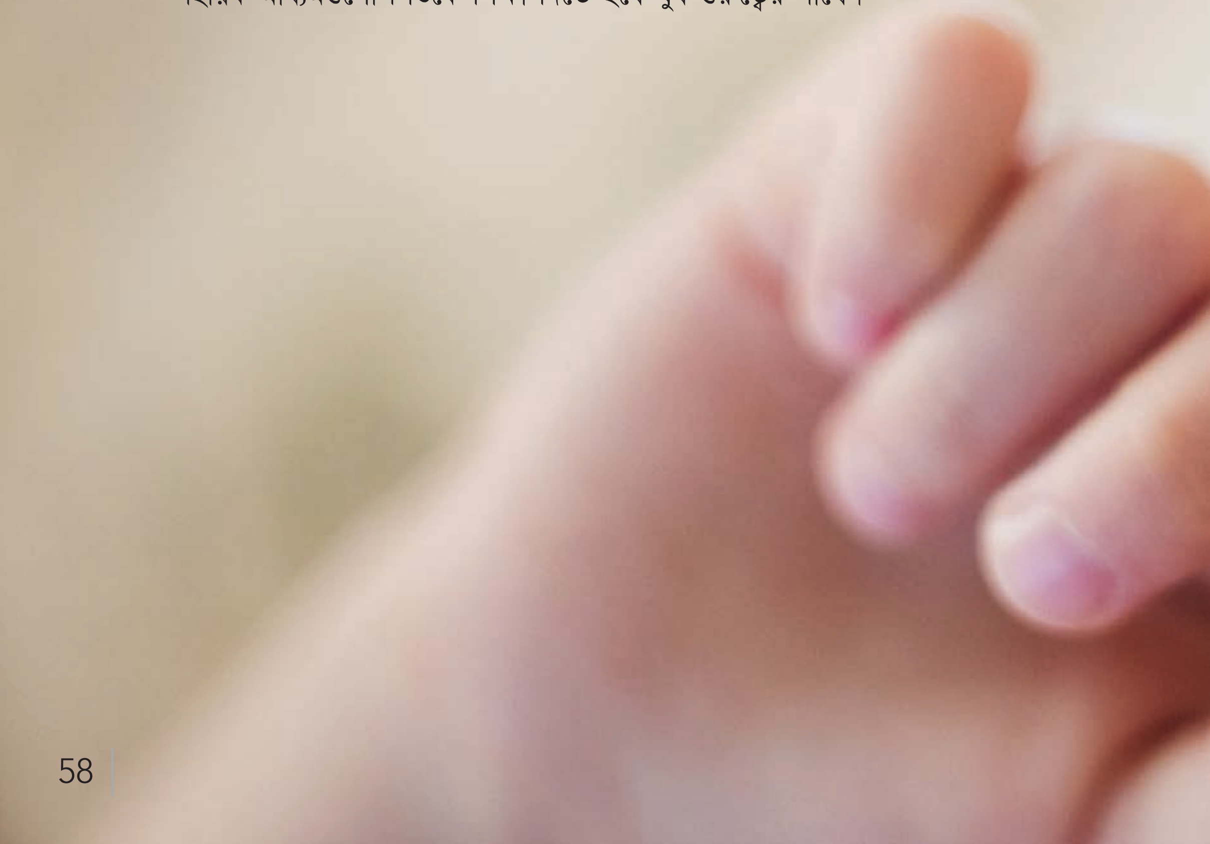

দ্বিতীয় স্তম্ভ:

ফিতিশতাদের প্রতি বিশ্বাস-

বেশ কয়েকটি বিষয়ের সমন্বয়ে ফিরিশতাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন পূর্ণতা পায়। যথা: ১. ফিরিশতা নামক আল্লাহর যে সৃষ্টিজগত আছে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। ২. নাম জানা ফিরিশতাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। ৩. ফিরিশতা সম্পর্কিত বিশুদ্ধ সংবাদগুলো বিশ্বাস করা। এবং ৪. তাদেরকে ভালোবাসা। **শিশু মানসপটে ফিরিশতাদের বিষয়ে যেসব অতি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষনীয় বার্তা খোদাই করা প্রয়োজন তা হলো:**

১. তাকে শেখাতে হবে, ফিরিশতারা নূরের তৈরী আল্লাহ তা'আলার এক বিশাল সৃষ্টিজগত। বিষয়টি নাবী ﷺ সূত্রে আয়েশা রা এর কাছ থেকে শুনা যাক: **'ফেরেশতাদেরকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে আর জিন জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে নির্ধূম অগ্নিশিখা হতে এবং আদাম ('আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে ঐ বস্তু হতে যে সম্পর্কে তোমাদেরকে বর্ণনা করা হয়েছে'**। (সহীহ মুসলিম-২৯৯৬)।

ফিরিশতাদেও সৃষ্টিপ্রকৃতি নিয়ে বিশদ বর্ণনা না শিখিয়ে তাদের ব্যাপারে সাধারণ বিষয়গুলোর আলোচনা যথেষ্ট।

২. যে সকল ফিরিশতাদের নাম কুরআন-সুন্নাহতে বিবৃত হয়েছে, শিশুকে তাদের নাম শেখাতে হবে। যথা: জিবরাঈল আমীন عليه السلام; যিনি ফিরিশতাদের পরিচালক এবং তাদের নেতা। তিনি ওহী নিয়ে আসেন। মিকাঈল عليه السلام, যিনি বৃষ্টির দায়িত্বে নিয়োজিত। ইসরাফীল عليه السلام, যিনি সিঙ্গায় ফু দেওয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত। আরশবাহী কিছু ফিরিশতা রয়েছে। কিছু রয়েছে বানী আদমের ভালো-মন্দ লিপিকার। আবার কতক আছেন বান্দাদের নিরাপত্তার দায়িত্বে। এছাড়াও আরও বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত ফিরিশতা রয়েছে।

৩. শিশুকে জানাতে হবে, ফিরিশতাদের সংখ্যা অগণিত অজস্র। একমাত্র আল্লাহ তা'আলা তাদের সংখ্যা জানেন। তাদের সৃষ্টি রবের আনুগত্য করার জন্য। তাঁর অর্ডার বাস্তবায়নের জন্য। যাকে যে দায়িত্ব দেয়া হয়, সে তা সুচারুরূপে পালন করে।

৪. তারা নিষ্পাপ। অনবরত ইবাদতে লিপ্ত। এতে ক্লান্ত হয় না। আবার না আছে অহমিকার কোন লেশ। তারা মু'মিনদের ভালোবাসে, সহযোগিতা করে, তাদের কল্যাণের দোয়া করে, তাদের নিরাপত্তা দেয়। আবার দীনী মজলিস খুঁজে খুঁজে সেখানে গিয়ে বসে।

৫. ফিরিশতাদের সাথে শিশুর মিতালী জমাতে হবে। কিভাবে? তাদের খায়ের খাঁ স্বভাবটা শিশুর কাছে বোধগম্য করতে হবে। মু'মিনদের বিষয়ে তারা যে আগ্রহী এবং যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়, সেটি তাকে বুঝাতে হবে। এভাবে ফিরিশতা জগতের প্রতি শিশুর ভালোবাসা এবং মৈত্রীর প্রেরণা সৃষ্টি হবে। কারণ; তারা তাসবীহ জপে, মু'মিনদের জন্য দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করে। ঈমান এবং সৎ কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে সঠিক পথের উপর অনঢ় মু'মিনদের নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতের সুসংবাদ দেয়। তাদের সাহায্য করে এবং দীনের উপর দৃঢ় থাকতে সহায়তা করে। তাদের আমাল রক্ষণাবেক্ষণ করে। আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাদেরকে বানী আদামের নিরাপত্তার জন্য প্রেরণ করেন। কুরআন জানাচ্ছে: **মানুষের জন্য তার সম্মুখে ও পশ্চাতে একের পর এক প্রহরী ফেরেশতা থাকে; তারা আল্লাহর আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে।** (সুরা আর-রা'দ-১১)

৬. ফিরিশতাদের বিশ্বাস করলে তাদেরকে সম্মান করতে হবে, মর্যাদা দিতে হবে। তারা আল্লাহর সম্মানিত বান্দা। তাদেরকে কোন আদেশ করলে অমান্য করে না। বরং যা করতে বলেন তাই করে। তাদের শানে বেমানান এমন সকল উপাধি, বৈশিষ্ট, চিন্তা-চেতনা, কু-ধারণা সবকিছু পরিহার করতে হবে।

৭. নিজেকে পবিত্র রাখার বিষয়ে শিশুকে উৎসাহিত করতে হবে। যেন সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। কারণ; বানী আদমের জন্য কষ্টদায়ক বিষয়গুলো ফিরিশতাদের কষ্ট দিয়ে থাকে। জাবির রাযি: এর মুখ থেকে শোনা যাক: **'যে এ রসুন জাতীয় উদ্ভিদ খাবে- কোন কোন সময় আবার তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি পিঁয়াজ, রসুন বা মূলা খাবে, সে যেন আমাদের মাসজিদের কাছেও না আসে। কেননা মানুষ যেসব জিনিস দ্বারা কষ্ট পায়, ফেরেস্তাগণও সেসব জিনিস দ্বারা কষ্ট পায়'**। (সহীহ মুসলিম, হাদিস নং-৫৬৪)।

৮. ফিরিশতা জগতের বিদ্যমানতা এবং তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কতগুলো হিকমাত রয়েছে। যেমন: (১) মানুষ জানতে পারবে আল্লাহর জ্ঞানের গভীরতা। তাঁর ক্ষমতার বিশালতা। তাঁর প্রজ্ঞার অপূর্বতা। (২) একজন মুসলিম নিরাপদ বোধ করবে। কারণ; সে জানে আল্লাহর পক্ষ হতে একদল সৈন্য তার নিরাপত্তায় নিয়োজিত। তাকে সহযোগিতা করার জন্য প্রস্তুত।

৯. আমাদের সাথে ফিরিশতাদের সৃষ্টি, অস্তিত্ব ও পর্যবেক্ষণগত যে সম্পর্ক সেটি মানুষকে তার গুরুত্ব ও মর্যাদা বলে দেয়। প্রত্যাখ্যান করে তার তুচ্ছতা ও নগ্যনতার ধারণা বা মতবাদকে। এর মাধ্যমে সে তার অত্মমর্যাদা নির্ধারণ করবে আর সর্বাত্তক চেষ্টা করবে তার অর্পিত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের।

তৃতীয় স্তম্ভ:

আসমানী গ্রন্থসমূহের প্রতি বিশ্বাস

আসমানী গ্রন্থসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন বেশ কিছু বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন:

১. আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অবতারিত গ্রন্থসমূহের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা। তিনি প্রতিটি সম্প্রদায়ের জন্য সঠিক পথের দিশারী কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। দিয়েছেন তাদের উপযোগী বিধি-বিধান। অবশ্যই এটি বান্দার প্রতি আল্লাহ তা'আলার অপার অনুগ্রহ। আসমানী কিতাব নাযিলের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা যে আমাদের প্রতি বিশাল অনুগ্রহ করেছেন- এটি শিশুর নিকট স্পষ্ট করতে হবে। কারণ; এই গ্রন্থগুলো আমাদেরকে আল্লাহর সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। বাতলে দিয়েছে কোনটি ভালো আর কোনটি মন্দ। বলে দিয়েছে আখিরাত নামক অনন্তকালের এক জীবন রয়েছে।

২. নাম জানা গ্রন্থগুলোকে সত্যায়ন করা। যেমন: ইবরাহীম عليه السلام এর সুহুফ। তাওরাত; যা মুসা عليه السلام পেয়েছেন। দাউদ عليه السلام এর নিকট আগত যাবুর। ইঞ্জিল; যা ঈসা عليه السلام কে আল্লাহ দিয়েছেন। নাবী মুহাম্মাদ ﷺ কতৃক আনিত কুরআন।

৩. গ্রন্থগুলো একটি অপরটিকে সত্যায়ন করে। মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না। এগুলোর মধে পরস্পর বিরোধী কোন বক্তব্য থাকতে পারে না। স্পষ্টভাবে আল্লাহ এটি জানিয়েছেন: **'যা সত্যায়নকারী পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবসমূহের'**। (সুরা আল-মায়েদা, আয়াত নং-৪৮)।

৪. কিতাবগুলোর বিশুদ্ধ সংবাদ যা রয়েছে, তা সত্য হিসেবে বিশ্বাস করা। শিশুকে জানাতে হবে, পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহে পরিবর্তন-পরিবর্ধন এবং কাঁট-ছাট করা হয়েছে। কারণ; সেগুলো ছিল সাময়িক, শুধুমাত্র সেই সময়ের অধিবাসীদের জন্য। কুরআনের মত সেগুলোকে সংরক্ষণের নিশ্চয়তা আল্লাহ দেন নি।

৫. কুরআনের মাধ্যমে পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলো রহিত হয়েছে। কুরআনের বিধি-বিধানের উপর আমল অবধারিত কিয়ামত পর্যন্ত। অতএব, এর আদেশগুলো মান্য করা, নিষেধগুলো হতে বিরত থাকা, যা হারাম ঘোষণা করেছে সেগুলো হারাম সাব্যস্ত করা, হালালগুলোকে বৈধ বলা, মুহকামগুলোর প্রতি আমল করা, মুতাসাবিহগুলো মেনে নেওয়া এবং এর আঁকা সীমারেখাকে অতিক্রম না করা অতি আবশ্যক।

এ অধ্যায়ের সাথে সম্পৃক্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো: শৈশব থেকে শিশুকে কুরআন মুখস্থ করানো। কুরআন মুখস্থকরণ শিশুর মেধা বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ একটি মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। যদি এটিকে ভালোভাবে কাজে লাগানো যায়। আর অভিভাবক শিশুর অন্তরে আয়াতের পরিবেশকে প্রাণবন্ত করতে সক্ষম হয়। কুরআন আহ্বান জানায় আসমান-যমিন,

মানব এবং চারপাশের সকল বস্তুর সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করতে, ভাবনার জগতে বিচরণ করতে। এতে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পাবে। মিশ্রণ ঘটবে তাত্ত্বিকতার সাথে প্রাক্টিকালের। কুরআন মুখস্থ করা, এর অর্থগুলো জানা ও বুঝা একজন মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার উন্নত স্তরে পোঁছে দিবে। বিশুদ্ধ কুরআন পাঠ শিশুকে সুভাষী ও বাগ্মী বানাবে। এই উপকারিতাগুলো পেতে হলে কতগুলো পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। যথা: ১. কুরআনের বিশুদ্ধ তিলাওয়াতের মাধ্যমে শিশুর রসনার জড়তা ছড়ানো। ২. ভয়, একাগ্রতা, আশা-প্রত্যাশার মত রব্বানী অনুভূতি তার মাঝে লালন করা। ৩. প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কুরআনের শিক্ষা অনুসারে আমালে অভ্যস্ত করানো, কুরআনের রংয়ে রঙ্গিন করা। ৪. শিশুকে সঠিক জীবন ব্যবস্থা ও উন্নত চরিত্রে উপর গড়ে তোলা ইত্যাদি। আবার কুরআন মুখস্থের হালাকায় একত্রিত হলে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অঢেল সাওয়াব ও বিশাল অনুগ্রহ তো মিলবেই।

শিশুকে হিফযে অনুপ্রাণিত করবো যেভাবে

১. কুরআন মুখস্থ, এর তিলাওয়াত, শিক্ষাদান এবং এর প্রতি আমলের মর্যাদা তার সামনে তুলে ধরবো। যেমনটি নাবী কারীম ﷺ এর একাধিক হাদিস থেকে জানতে পারি। প্রথমটি আবু উমামা আল-বাহিলী রাযি:এর মুখ থেকে শোনা যাক: **তোমরা কুরআন পাঠ কর। কারণ ক্বিয়ামাতের দিন পাঠকের জন্য তা শাফা'আতকারী হিসেবে আসবে।** (সহীহ মুসলিম, হাদিস নং-৮০৪)। এদিকে আব্দুল্লাহ বিন আমর রাযি: জানাচ্ছেন: **কিয়ামতের দিন কুরআনের বাহককে বলা হবে, পাঠ করতে থাক আর উপরে আরোহণ করতে থাক। দুনিয়াতে যেভাবে ধীরে সুস্থে পাঠ করতে ঠিক সেরূপে পাঠ করতে থাক। যে আয়াতে তোমার পাঠ সমাপ্ত হবে সেখানেই তোমার স্থান।** (তিরমিযী, হাদিস নং-২৯১৪)। এবার কারী সাহাবী আবু মুসা আল-আশ'আরী রাযি: এর নিকট আসি। তিনি রাসূল ﷺ থেকে কুরআন পাঠের ফযিলত তুলে ধরছেন এভাবে: **যে মু'মিন কুরআন তিলাওয়াত করে সে লেবুর সাথে তুলনীয়, যার ঘ্রাণও উত্তম, স্বাদও উত্তম। আর যে মু'মিন কুরআন তিলাওয়াত করে না, সে খেজুরের সাথে তুলনীয়, যার ঘ্রাণ নেই ত বে স্বাদ মিষ্ট। যে মুনাফিক কুরআন তিলাওয়াত করে, সে রায়হানা নামক ফুলের সাথে তুলনীয়, যার ঘ্রাণ অতি উত্তম, কিন্তু স্বাদ বড় তিক্ত। আর যে মুনাফিক কুরআন পাঠ করে না, সে হানযালা ফলের সাথে তুলনীয়, যার ঘ্রাণ নেই, স্বাদও অতি তিক্ত।** (সহীহুল বুখারী- ৫৪২৭)। আবার কুরআন পঠন ও পাঠনকে শ্রেষ্ঠ পেশা ঘোষণা করা হয়েছে নিচের হাদিসে: **তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি সর্বোত্তম যে কুরআন শিখে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়।** (সহীহুল বুখারী, হাদিস নং-৫০২৭)

এরপর সালাফরা কুরআনের প্রতি কতটুকু গুরুত্বারোপ করতেন তার কিছু নমুনা তুলে ধরবো। তাহলে হিম্মত বেড়ে যাবে। আগ্রহী হয়ে উঠবে কুরআনের প্রতি।

২. তাকে কুরআনিক মাদরাসায় বা মসজিদে কুরআন হিফযের হালাকায় ভর্তি করাবো। কিংবা তার জন্য কুরআনের একজন শিক্ষক তালাশ করবো। এতে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য যত উপকরণ দরকার সব সরবরাহ করবো। ছোট-বড় উপহার রাখবো। সন্তান-সন্ততি ও ছাত্রদের মাঝে প্রতিযোগিতার একটি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করবো।

৩. শুরুতে শিশুর নিকট কুরআন মুখস্থের বিষয়টি সহজ করে দেয়া অতীব জরুরী। যাতে এ বিষয়টি তার কাছে প্রিয় হয়ে যায়। হিফযের আরম্ভটা হতে হবে আম্মা পারা দিয়ে। কারণ এর আয়াতের পরিধি ছোট। সহজে শিশু মানসে গেঁথে হয়ে যাবে। আবার এই সুরাগুলোতে ঈমানের রুকনগুলো আলোচিত হয়েছে। যা শিশুর আক্বিদা বিশুদ্ধকরণে এবং আচরণ সংশোধনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। বরং শিশুর সুস্থতা ও নিরাপত্তাও নিশ্চিত করবে। কারণ কুরআনে যিকির ও ঝাড়ফুঁক আছে। অধিকন্তু, এটি তার রসনার জড়তা কাটাবে। তাকে মনের ভাব ব্যক্ত করতে সহায়তা করবে।

৪. শিশুর তিলাওয়াত ও হিফযের ফাঁকে ফাঁকে কুরআনের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। যাতে তার মনে আয়াতের অর্থ ডালপালা মেলে। ছোট শিশুর আবার কিসের ব্যাখ্যা- এমন ধারণা যেন কারো না জন্মায়। কারণ শিশুর হিফয ও বুঝশক্তি অবিশ্বস্য রকমের।

৫. শিশুকে শেখাবো কুরআনে রয়েছে রোগের আরোগ্যতা, রহমত ও বরকত। আল্লাহ তা'আলা এটি আমাদেরকে জানিয়েছেন: **'আমি কুরআনের এমন আয়াত অবতীর্ণ করি, যা মু'মিনদের জন্য আরোগ্য ও রাহ্‌মাত'**। (সুরা আল-ইসরা, আয়াত নং-৭২)।

যার পুরো কুরআন বা এর অংশবিশেষ মুখস্থ আছে, সে নিজেকে এবং তার চারপাশের মানুষকে ঝাড়ফুঁক করতে পারবে।

চতুর্থ স্তম্ভঃ

রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস-

রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন বেশ কতগুলো বিষয়ের সমষ্টি। যথা: ১.তাদের সত্যায়ন করা, ২.তাদের সম্পর্কে বর্ণিত বিশুদ্ধ সংবাদগুলো বিশ্বাস করা, ৩.নাম জানা রাসূলদের সে নামে বিশ্বাস করা, ৪.আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে স্বগোত্র হতে নির্বাচন করেছেন, চারিত্রিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে তাদেরকে অন্যদের থেকে আলাদা করেছেন, যাতে তারা রিসালাতের গুরুদায়িত্ব পালন করতে পারেন- এ বিশ্বাস রাখা। কুরআনের ভাষায় এটি বিবৃত হয়েছে: **'আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি যাতে তাদের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে'**। (সুরা ইবরাহীম, আয়াত নং-৪)

রাসূল ফিরিশতা হলে তারা তার কথা বুঝত না। ৫. কাউকে গ্রহণ এবং কাউকে প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে রাসূলদের মাঝে কোন পার্থক্য না করা। বরং তাদের সবাইকে বিশ্বাস করতে হবে, গ্রহণ করতে হবে। সকল রাসূল নিজ রিসালাতের ক্ষেত্রে সত্যবাদী। উম্মাতের কল্যাণকামনায় ন্যায়পরায়ণ। ৬. তারা আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে নিষ্পাপ- এ বিশ্বাস রাখা। ৭. সর্বশেষ নাবী মুহাম্মাদ ﷺ এর শরিয়তের উপর আমাদের আমল করা।

রাসূলদের প্রতি ঈমান কেন্দ্রিক নিম্নোক্ত বিষয়গুলো শিশু মানসে গেঁথে দেওয়া চাইঃ

১. আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জাতির জন্য তাদের মধ্য হতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন। তিনি তাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদাত করতে বলেন। আল্লাহ বিনে অন্য যাদের ইবাদাত করা হয়, তাদের ছুঁড়ে ফেলতে বলেন। তারা সবাই সত্যবাদী, সত্যায়নকৃত, ন্যায়পরায়ণ, সুপথপ্রাপ্ত, আল্লাহভীরু এবং বিশ্বস্ত।

২. আদম ﷺ হতে মুহাম্মাদ ﷺ পর্যন্ত সকল রাসূলদের দাওয়াত ছিলো একই। তাওহীদের দাওয়াত তথা বিশ্বাস, কথা ও কর্মগত সকল ইবাদাতে আল্লাহর একাত্মতা স্বীকার করা এবং আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদাত করা হয়, তাদের অস্বীকার করা।

৩. সৃষ্টিজগতের নিকট রাসূল প্রেরণের ঐশী হিকমাত তুলে ধরা। যেমনঃ আল্লাহর ইবাদাত ও তাঁর একাত্মবাদ প্রতিষ্ঠা করা। মানুষদের সঠিক পথের সন্ধান দেওয়া। তাদেরকে দ্বীন দুনিয়ার বিষয়াদি শিক্ষা দেওয়া এবং অমানিষা হতে বের করে আলোতে নিয়ে আসা। উম্মাকে পরিচালনা করা এবং তাদের মাঝে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করা। তাদের অনুসরণ করা এবং তাদের দেখানো পথে চলা।

৪. তাদের ভেতর এ বুঝ গ্রথিত করা যে, আল্লাহ বান্দাদের প্রতি সদয় এবং যত্নশীল। কারণ তিনি রাসূলদের পাঠিয়েছেন বান্দাদের সরল পথের দিশা দেয়ার জন্য। এই বিশাল নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের তাগাদা দেওয়া। নাবী-রাসূলদের ভালোবাসা শিশুর মধ্যে গ্রোথিত করা। কারণ তারা রবের বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। অবিরত উম্মাতের কল্যাণের চিন্তায় মগ্ন থেকেছেন। মানুষ জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচক্ষণতায় যত উন্নতই হোক না উম্মাতের জন্য একটি পরিপূর্ণ জীবনবিধান রচনা করতে সমর্থ হবে না। রাসূলগণ মানুষদের উপকারী বিষয়াদি বাতলে দেন আর ক্ষতিকর বিষয়াদি হতে বারণ করেন।

৫. শিশু মননে রাসুলের মহব্বত গেঁথে দিতে হবে। তাহলে সে তাঁর অনুগত্য করবে, তাঁর দেখানো পথে চলবে এবং তাঁর মর্যাদা নিজের মধ্যে খোদাই করবে। রাসুলের ভালোবাসার উপর অন্য কারো ভালোবাসাকে অগ্রাধিকার দিবে না। রাসুলের বন্ধুদেরকে মৈত্রী ভাববে আর তাঁর শত্রুদের সাথে শত্রুর আচরণ করবে। তাঁর নাম নেওয়া হলে নিজের মধ্যে শ্রদ্ধার ভাব পরিলক্ষিত হবে। তাঁর প্রতি দুরুদ পাঠে কার্পণ্য করবে না। তিনি বিশ্বজাহানের প্রতি রহমত স্বরুপ। তাই নবী চরিতকে যথাযথ গুরুত্ব দিবে। মসজিদে নববী যিয়ারতের সুযোগ যে লাভ করলে, সেখানে সে কণ্ঠস্বর নিচু করবে। নাবী ﷺ এর করবের সামনে দাঁড়ানোর সৌভাগ্য যার হলে, সে যথাযথ সম্মানের সাথে সালাম দিবে।

শিশুকে নাবীর ভালোবাসা শেখাবো যেভাবে:

১. আল্লাহ তা'আলা তদীয় নাবীকে ভালোবসেন। তাকে রাসূল হিসেবে চয়ন করে সমগ্র মানব জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। আমাদের উপর নাবীর ভালোবাসাকে অবধারিত করেছেন– এ বিষয়গুলো শিশুর নিকট দৃঢ়তার সাথে তুলে ধরতে হবে। তাকে শেখাতে হবে যে, নাবীকে ভালোবাসলে আল্লাহকে ভালোবাসা হয়। নাবীর ভালোবাসা আল্লাহকে আন্তরিক ভালোবাসার বহি:প্রকাশ।

২. হেদায়াতের বাণীসহ এই দ্বীন পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে নাবী ﷺ ছিলেন বিশ্বজাহানের জন্য রহমত স্বরূপ। আবার ক্বিয়ামতের দিন মু'মিনদের জন্য সুপারিশের মাধ্যমে তাদের প্রতি সদয় হবেন– দরদ দিয়ে এ বিষয়টি শিশুকে জানাতে হবে।

৩. নাবী চরিতের কিছু অধ্যায় শিশুকে পড়ে শুনাতে হবে। যাতে সে জানতে পারবে, রাসূল ﷺ সমগ্র মানবতার সর্বোচ্চ অনুকরণীয় আদর্শ। তাঁর মাধ্যমে সংঘটিত অলৌকিক ঘটনাবলী শিশুর সামনে তুলে ধরতে হবে। উন্মোচন করতে হবে তাঁর মহান চারিত্রিক দিকগুলো। তিনি কিভাবে নির্যাতিতদের সহায়তা করেছেন সে চিত্রও ফুটিয়ে তুলতে হবে। দরিদ্রদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি, ইয়াতিমের জন্য তাঁর উপদেশ এবং অসহায়দের প্রতি তাঁর দয়ার কালজয়ী কাহিনী শিশুর মানসপটে খোদাই করতে হবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, আমাদের বাচনভঙ্গি যেন শিশুর বিকাশমান স্তরের সাথে জুতসই হয়। সে

বুঝতে পারবে এমন বিষয়গুলোই তার সামনে তুলে ধরতে হবে। তাহলে সহজে এসব ধারণ করতে পারবে। এগুলো উপস্থাপনে বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করতে হবে যাতে শিশুর বিকাশমান বয়সের চাহিদা পূরণ হয়। আবার ব্যক্তির স্বভাবগত বিভিন্নতা এবং পরিবেশ পরিস্থিতির দাবীকে সামনে রেখে সেগুলো তুলে ধরতে হবে।

৪. পিতা-মাতা এবং চারপাশের সবাই নাবী ﷺ কে সম্মান করছে। তাঁর সুন্নাতের যথাযথ মর্যাদা দিচ্ছে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাকে অনুসরণের আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে। নাম শুনা মাত্রই মুখ দিয়ে দুরুদ উচ্চারিত হচ্ছে– এসব দৃশ্য দেখতে দেখতে বেড়ে উঠাটা একজন শিশুর জন্য খুবই জরুরী। অভিভাবকদের বাস্তবিক আচরণ বা চালচলন শিশু লালন-পালনে খুব বড় প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। যেমন: অভিভাবক সুন্নাত বা নফল আদায় করে সন্তানদের বলল: রাসূল ﷺ এভাবে এটি আদায় করতেন। শিশুর সঠিক বিকাশ এবং নির্ভেজাল আকিদা বিনির্মাণে রোল মডেল সামনে রেখে প্রতিপালনের প্রভাব অকল্পনীয়। আর আমাদের রোল মডেল নাবী মুহাম্মাদ ﷺ। অভিভাবকদের উচিত সন্তানদের সাথে নিয়ে তাঁকে অনুকরণ করা, তাঁর দেখানো পথে চলা, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর সুন্নাতের বাস্তবায়ন করা।

৫. ইসলামের সৌন্দর্য, নাবী চরিত এবং সাহাবাদের ফযিলত সংক্রান্ত কিছু বিশুদ্ধ হাদিস শিশুকে মুখস্থ করাতে হবে। ঈমান মজবুতকরণ, আচার-আচরণ পরিমার্জন এবং পরিছন্ন আত্মা গঠনে হাদিসে রাসুলের অনেক বড় প্রভাব রয়েছে। শিশুদের মাঝে হাদিস মুখস্থ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে। সিলেবাসে থাকবে অল্পসংখ্যক হাদিস। যেগুলোর কলেবর ছোট, অর্থ সুস্পষ্ট আর তাতে থাকবে শিশুদের জন্য উন্নত চরিত্রের নির্দেশনা। সেখানে থাকতে হবে তাদেরকে আকর্ষণের নানা মাধ্যম। থাকবে নগদ অর্থসহ নানা ধরনের পুরস্কার।

৬. রাসুলের সাথে সাহাবাদের নির্মল আচরণ, তাঁর প্রতি তাদের নিখাদ ভক্তি ফুটে উঠেছে যে গল্পগুলোতে সেগুলো শিশুর সামনে তুলে ধরতে হবে। বিশেষত: শিশু সাহাবীদের কাহিনীগুলো। যেমন: নাবী ﷺ এর পরিপূর্ণ অনুসরণে আনাস রাযি: এর ঘটনাটি। চলুন, শোনা যাক সেই ঘটনা। **‘একদা এক দর্জি নাবী ﷺ কে খাবারের দাওয়াত দিল। আনাস রাযি: জানাচ্ছেন: রাসূল ﷺ এর সাথে আমিও সেই দাওয়াতে শরিক হলাম। দর্জি নাবী ﷺ এর সমীপে জবের রুটি আর গোশত মিশ্রিত লাউয়ের ঝোল পেশ করল। আনাস রাযি: দেখলেন, রাসূল ﷺ প্লেটের চারপাশ থেকে লাউ টুকরাগুলো বেছে বেছে খাচ্ছেন। এ দৃশ্য দেখে লাউয়ের টুকরাগুলো তাঁর সামনে জমা করতে লাগলেন। তিনি বলেন: সেদিন থেকে অদ্যবধি আমার পছন্দের তালিকায় লাউয়ের স্থান উপরের সারিতে’**। (সহীহুল বুখারী, হাদিস নং-৫৪৩৯)

রাসুলের প্রতি সাহাবাদের ভালোবাসা এবং তাঁর জন্য জান বাজি রাখার দৃশ্যগুলো শিশুর সামনে তুলে ধরতে অভিভাবককে আগ্রহী হতে হবে।

৭. রাসূলকে ভালোবাসলে কী পাওয়া যাবে- সেটিও শিশুকে জানাতে হবে। বিষয়টি আনাস রাযিঃ জানাচ্ছেন: **‘জনৈক ব্যাক্তি নাবী ﷺ কে কিয়ামত সংঘটনের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন: তুমি কিয়ামতের জন্য কী প্রস্তুত রেখেছ? উত্তরে সে বলল: কিছুই না। তবে আমার একমাত্র সম্বল, আমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে ভালোবাসী। নাবী ﷺ বললেন: তুমি যাকে ভালোবাসো তার সাথে তুমি থাকবে। আনাস রাযিঃ বলেন: রাসূল ﷺ এর এই কথায় আমরা যারপরন্যায় আনন্দিত হলাম। তিনি আরও বলেন: আমি নাবী ﷺ, আবু বাকর ও উমার রাযিঃ কে ভালোবাসী। ভালোবাসার প্রতিদান স্বরুপ আমি তাদের সাথে থাকবো এই আশা রাখি। যদিও তাদের মত আমল আমি করতে পারি নাই’।** (সহীহুল বুখারী, হাদিস নং-৩৬৮৮)

৮. নাবী ﷺ এর ভালোবাসা সংক্রান্ত সৃজনশীল কোন কিছু প্রস্তুত করতে শিশুকে সহায়তা করতে হবে। যেমন: নাবী ﷺ এর ভালোবাসার বিষয়ে কবিতা রচনা, ছোট গল্প লিখা, খুতবা দেওয়া, প্রবন্ধ রচনা, বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা ইত্যাদি।

পঞ্চম স্তম্ভঃ

পরকালের প্রতি বিশ্বাস-

পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের সাথে অনেক বিষয় জড়িত। যথা: মৃত্যু, পুনরুত্থান, হিসাব, প্রতিদান, সিরাত, মিযান,জান্নাত এবং জাহান্নাম ইত্যাদি। একজন শিশু বাছ-বিচারের বয়সে উপনীত হওয়ার পর পরকালের কিছু বিষয় সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে আরম্ভ করে। এর পূর্ব পর্যন্ত এর সংক্রান্ত আলোচনা সংক্ষেপণের মোড়কে বাঁধাই থাকা ভালো। আমরা শিশুকে বলবো: এই জীবন ছাড়াও আরো একটি জীবন আছে। অন্তকালের জীবন। সেখানে আল্লাহ জান্নাত প্রস্তুত রেখেছেন মু'মিনদের জন্য। আর কাফিরদের জন্য জাহান্নাম।

আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস কেন্দ্রিক নিন্মোক্ত ভাবনাগুলো শিশু মানসে গেঁথে দিতে হবেঃ

১. শিশুকে জানাতে হবে, আল্লাহ তা'আলা সবাইকে কিয়ামতের দিন মৃতু হতে জীবিত করবেন, দুনিয়ার কৃতকর্মের বদলা দেওয়ার জন্য। ভালো হলে ভালো আর মন্দ হলে মন্দ।

২. তাকে অবগত করতে হবে, আল্লাহ তা'আলা পরকালে অনন্ত সুখ-শান্তির গৃহ জান্নাত প্রস্তুত রেখেছেন। তিনি এটি সৃষ্টি করেছেন মু'মিন বান্দাদের পুরস্কৃত করবার জন্য। অপরপক্ষে, কাফিরদের কৃতকর্মের বিনিময় দেওয়ার জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জাহান্নাম। জান্নাতে মু'মিনদের জন্য আল্লাহ তা'আলা যে নিয়ামতরাজি প্রস্তুত রেখেছেন, সেগুলো বর্ণনা করে তাকে ভালো কাজে আগ্রহী করে তুলতে হবে।

৩. মৃত্যু ও আখিরাত নিয়ে শিশুর সাথে আলাপচারিতা হবে মনোরম পন্থায়। এতে ফুটে উঠবে বান্দার প্রতি আল্লাহর রহমত, মাগফিরাত ও অনুগ্রহের চিত্র। শিশুর চিন্তাজগত দখল করবে না কোন অস্থিরতা। চারপাশের সৃষ্টিকুলের চিত্র তুলে ধরা যেতে পারে বুঝের স্বার্থে। তারাও এভাবে বড় হচ্ছে। তাদেরও মৃত্যু হবে। কিন্তু মানব জাতিকে আল্লাহ তা'আলা কিছু গুরু দায়িত্ব দিয়ে বিশিষ্ট করেছেন। সমগ্র সৃষ্টিজগতকে তাঁর সেবায় করেছেন নিয়োজিত। আর তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রতিদানের।

৪. আল্লাহ তা'আলা যুলুমকে প্রশ্রয় দেন না। যালেমকে শাস্তি দিয়ে থাকেন। আর মাযলুমকে ন্যায়বিচার বঞ্চিত করেন না। সৎকর্মশীলকে তার সৎকর্মের প্রতিদান দেন। আমরা পার্থিব জীবনে দেখি কেউ যালেম হিসেবে জীবন যাপন করে। আবার যালেম আবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। তাই আরেকটা জীবন থাকতেই হবে যেখানে মুহসিন পাবে তার ইহসানের প্রতিদান, যালিম পাবে তার যুলুমের বদলা।

ষষ্ঠ স্তম্ভ:

তাকদীরের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস-

তাকদীরের প্রতি বিশ্বাসের চারটি শাখা রয়েছে। যথা: ১. আদি-অন্তের সবকিছু আল্লাহর জ্ঞানের আওতাভুক্ত। ২. সৃষ্টির সূচনালগ্ন হতে শেষ অবধি যা কিছু ঘটবে সবই তিনি লিখে রেখেছেন এবং তাঁর ক্ষমতা সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। ৩. সবকিছুর স্রষ্টা কেবলমাত্র তিনিই। ৪. তাঁর ইচ্ছার বাইরে কোন কিছুই ঘটে না। শৈশবের এই স্তরে শিশু ক্বযা ক্বদরের মত বিষয়গুলো বুঝবে না। কারো কারো মতে, নয় বছরের আগে এগুলোর তাৎপর্য অনুধাবন করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। **তবে তাকদীর সংক্রান্ত প্রতিপালন-মূলক কিছু উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য শিশুর মধ্যে রোপন করা উচিত**। যথা:

১. তাকদীর বিষয়ক মূলনীতিগুলো ইবনু আব্বাস রাযি: এর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। সেই মূলনীতিগুলো কুরআনের ভাষ্যকারের মুখ থেকে শোনা যাক: **'কোন এক সময় আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পিছনে ছিলাম। তিনি বললেন: বৎস! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি- তুমি আল্লাহ তা'আলার বিধি-নিষেধ রক্ষা করবে, আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখবে, আল্লাহ তা'আলাকে তুমি কাছে পাবে। কোন কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হলে আল্লাহর নিকট চাও। আর সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে আল্লাহর নিকটেই কর। জেনে রাখো, যদি সকল উম্মাত তোমার কোন উপকারের উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহলে ততটুকু উপকারই করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। আর যদি সকল উম্মাত তোমার কোন ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহলে ততটুকু ক্ষতিই করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। কলম তুলে নেয়া হয়েছে এবং লিখিত কাগজসমূহও শুকিয়ে গেছে'**। (তিরমিযী, হাদিস নং-২৫১৬)।

মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় একটু অন্যভাবে এসেছে। যথা: **'তুমি আল্লাহ তা'আলার বিধি-নিষেধ রক্ষা করবে, আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করবেন। সাচ্ছন্দের সময় তুমি তাকে চিনবে, তিনি তোমাকে বিপদ হতে উদ্ধার করবেন। কোন কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হলে আল্লাহর নিকট চাও। আর সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে আল্লাহর নিকটেই কর। ক্বিয়ামত পর্যন্ত যা ঘটবে তা লিখে কলম শুকিয়ে গেছে। সমগ্র সৃষ্টিজগত যদি তোমার কোন উপকার করতে চাই যা আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য লিখে রাখেন নি, তাহলে তারা তা করতে পারবে না। আবার সমগ্র সৃষ্টিজগত যদি তোমার কোন ক্ষতি সাধন করতে চাই যা আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য**

লিখে রাখেন নি, তাহলে তারা তা করতে পারবে না। জেনে রেখ, বিপদে ধৈর্যধারণের কল্যাণ অগণিত। ধৈর্য ধারণের পরেই আসে সাহায্য। আর কঠিনতার পরেই আসে সহজতা'। (মুসনাদ আহমাদ, হাদিস নং- ২৮০৩)

এই হাদিসে নববীটিকে শিক্ষা-বিষয়ক একটি ফোয়ারা বলা যায়। এখানে উম্মতের প্রতি বৃষ্টিদানার মত অসংখ্য নববী নির্দেশনা বর্ষিত হয়েছে। যাতে তারা সন্তানদের সঠিক বিশ্বাসের উপর গড়ে তুলার প্রতি গুরুত্বারোপ করে।

২. শৈশবের এই স্তরে শিশুর সাথে ক্বযা ও ক্বদর বিষয়ে আলোচনা পরিহার করটা মূলনীতি। তবে এ সংক্রান্ত কিছু বার্তা শিশুকে দেয়া যেতে পারে। যেমন: আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান ব্যাপক, তাঁর ক্ষমতা অসীম, সবকিছু তাঁর বেষ্টনীর মধ্যে আছে, তিনি-ই সকল সৃষ্টির স্রষ্টা, তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কোন কিছু হয় না ইত্যাদি। মানুষকে ইচ্ছার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। সে নিজের ঐচ্ছিক কৃতকর্মের জন্য পরিপূর্ণ দায়বদ্ধ থাকবে। এ জন্য প্রতিদান বা শাস্তি সে পাবে– খুব সংক্ষেপে এই বার্তাগুলো তাকে দেয়া যেতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ের ভাবনা যদি শিশু হৃদয়কে ব্যস্ত করে তোলে, তাহলে অভিভাবককে অবশ্যই যথাসম্ভব তা পরিষ্কার করার চেষ্টা করতে হবে। তবে অবশ্যই তার বোধশক্তির পরিধি কতটুকু, এক্ষেত্রে তা লক্ষ্য রাখতে হবে।

৩. যা প্রয়োজন তা যেন আল্লাহর কাছ থেকে চায়। অন্য কারও নিকট হাত না পাতে। একমাত্র আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে– এ বিষয়গুলো চর্চার উপর শিশুকে লালন করতে হবে। দু'আর মাধ্যমে সে রবের অভিমুখী হবে। জানবে যে, ভরসা কেবলমাত্র আল্লাহর উপর করতে হয়। আল্লাহর ফায়সালাতে বিপদগ্রস্ত হলে ধৈর্যধারণের সবকও সে শিখবে।

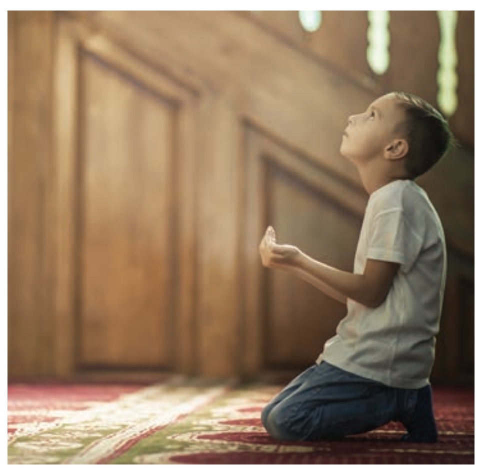

৪. শিশু নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহ তা'আলা তার কল্যাণই চান। সে এই পৃথিবীতে আল্লাহর তাকদীরের সাথে নির্দিষ্ট একটি সময় অতিবাহিত করবে। ফলে তার আত্মা সংকীর্ণ হয়ে যাবে না বা তাকে পেয়ে বসবে না কোন অস্থিরতা। সে আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্টচিত্তে বিপদ-আপদকে গ্রহণ করবে। সে দ্বিধা হীন -ভাবে আল্লাহর এ বাণীর প্রতি বিশ্বাস রাখবে: **'বল : 'আমাদের জন্য আল্লাহ যা নির্দিষ্ট করেছেন তা ব্যতীত আমাদের অন্য কিছু হবে না; তিনি একমাত্র আমাদের কর্মবিধায়ক এবং আল্লাহর উপরই মু'মিনদের নির্ভর করা উচিত'**। (সুরা আত-তাওবা, আয়াত নং-৫১)

৫. সব ঘটনা প্রবাহ আল্লাহর হাতে। তিনি যা ইচ্ছে করেন, তাই সম্পাদন করেন। কেননা তাঁর রাজত্বে সকল আধিপত্য তাঁরই– এগুলোও শিশুকে জানার সুযোগ করে দিতে হবে। ফলে সৃষ্টিকর্তার সাথে তার সম্পর্ক হবে নিবিড়। সবক্ষেত্রে ধাবিত হবে তাঁরই দিকে। এভাবে তার আশা-প্রত্যাশা দু'আ সব আল্লাহর সাথে জুড়ে যাবে।

৬. তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস শিশুর অন্তরে প্রশান্তি ও স্থিতি নিশ্চিত করবে। একজন মু'মিন যখন জানবে ভালো-মন্দ যাই হোক না কেন সবকিছুই তার জন্য কল্যাণকর। কেবল অকল্যাণ বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নাই। তখন এটি তার মানসিক স্থিতি ও প্রশান্তি নিশ্চিত করবে। আর যাবতীয় সমস্যা, কষ্ট-ক্লেশ, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠাকে সাদরে গ্রহণ করবে আল্লাহর ফায়সালা হিসেবে। এভাবে সে তার বিষয়টি আল্লাহর নিকট সঁপে দিবে। আর জীবন যাপন করবে প্রশান্ত চিত্তে। তাকদীরের প্রতি ঈমানদার বিপদ-বালায় ঘাবড়ে যাবে না বা এতে ক্ষুণড়বমনা হবে না। বরং রবের ফায়সালার অনুগত হবে। এতে রবের সাওয়াব আশা করবে। আর প্রথম ধাক্কাতেই আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী স্মরণ করবেঃ **'আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ প্রদান কর। যাদের উপর কোন বিপদ আসলে তারা বলে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহরই জন্যে এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। এদের উপর তাদের রবের পক্ষ হতে শান্তি ও করুণা বর্ষিত হবে এবং এরাই হেদায়াতপ্রাপ্ত'**। (সুরা আল-বাকারাহ, আয়াত-৫৭-১৫৫)।

৭. এমন অসংখ্য ঘটনা রয়েছে যেখানে মানুষ বিপদে পতিত হয়েছে। জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। আল্লাহর ফায়সালাতে সবকিছু ঘটেছে। তারা ধৈর্যধারণ করেছে। তাকদীরের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয় নাই। এর প্রতিদান হিসেবে আল্লাহ তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। তাদের বিষয়গুলো উত্তরোত্তর উন্নতির দিকে ধাবিত হয়েছে। এসব ঘটনা শিশুর সামনে তুলে ধরে উপকার নেয়া যেতে পারে।

৮. তাকদীরের প্রতি ঈমানের সারসংক্ষেপ হলোঃ সবকিছুর সামগ্রিক এবং বিস্তারিত জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার রয়েছে। সৃষ্টির সূচনালগ্ন হতে কিয়ামত অবধি যা কিছু ঘটবে, সবই তিনি লাওহে মাহফুযে লিখে রেখেছেন। তাঁর সৃষ্টি এবং ইচ্ছার বাইরে কোন কিছু হবে না।

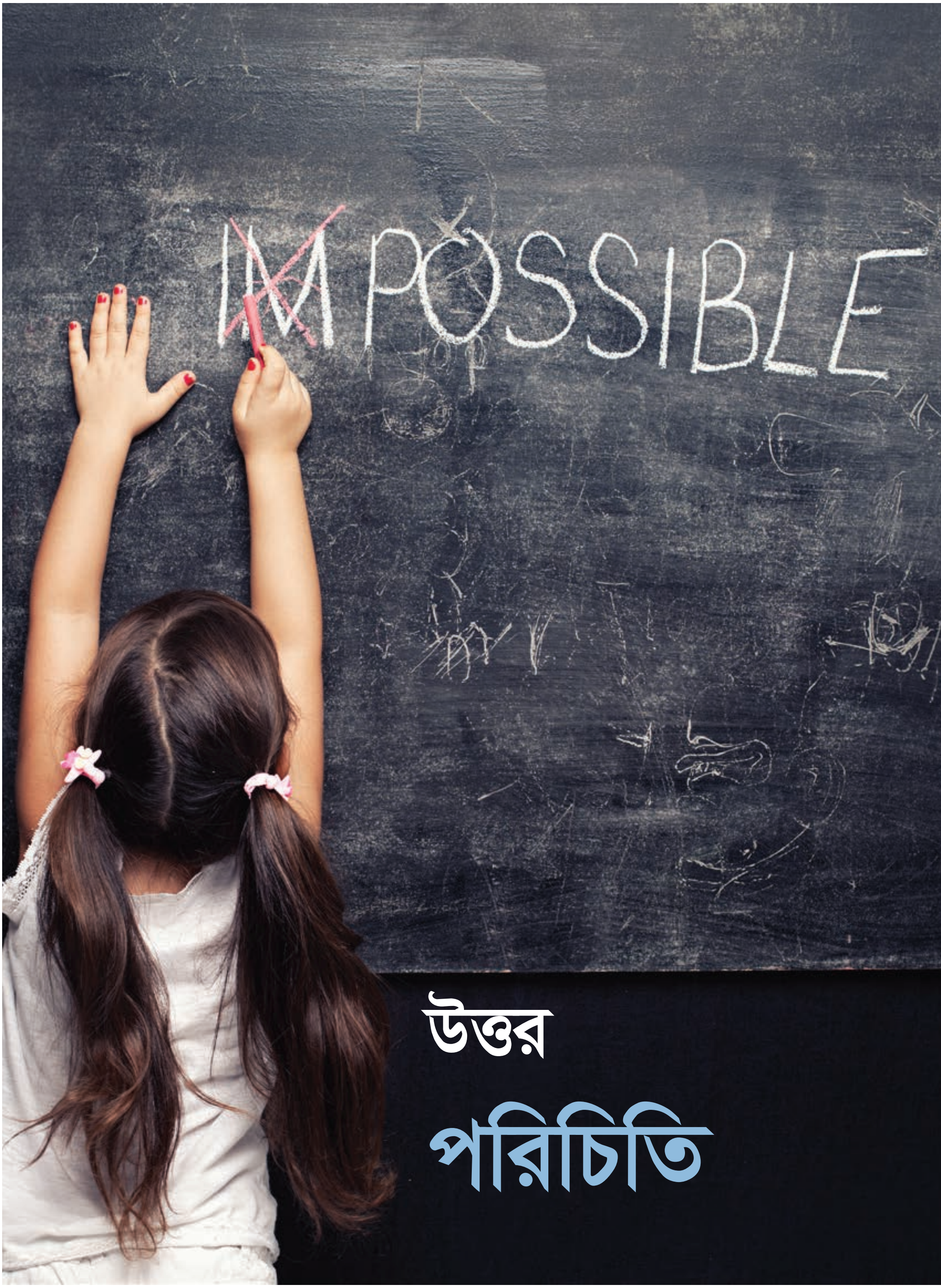

উত্তর পরিচিতি

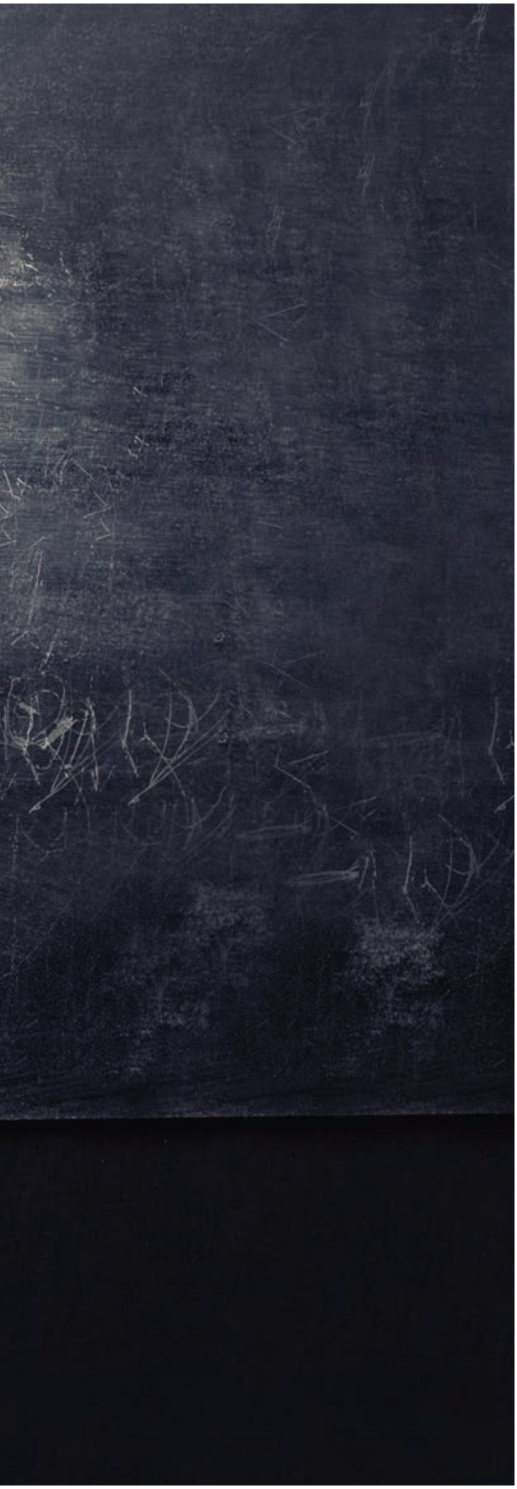

শিশুরা প্রশ্ন করতে ভালোবাসে। সৃষ্টিকর্তা এ ভালোবাসা দিয়ে তাদের পয়দা করেছেন। যাতে প্রশ্ন করে প্রচুর পরিমাণ তথ্য সে তার ব্রেনে জমা করতে পারে। শৈশবের সময়টা প্রশ্ন করার সময়কাল হিসেবে বিবেচিত। এই সময়টাতে শিশুদের অধিকাংশ কথাবার্তা ও আলোচনা হয়ে থাকে প্রশ্নের ছলে। শিশুদের মনে হয়, তারা চারপাশের কোন কিছুই জানে না। আর যেহেতু অজ্ঞতা থেকেই ভীতির সূচনা, তাই সর্বতোভাবে তারা জানার এবং শেখার দিকে ধাবিত হয়। তাই তো আমরা দেখি, তিন বছরের ছোট্ট শিশুটি তার বাবা এবং বড় ভাইকে প্রতিনিয়ত হাজারো প্রশ্নবাণে জর্জরিত করছে। তাদের প্রদত্ত উত্তর কিন্তু সন্দেহাতীতভাবে তার মধ্যে প্রভাব ফেলে। ক্রমান্বয়ে জ্ঞানের উঁচু স্তরে নিয়ে যায় তাকে। এটি ফুঁটে উঠে তার প্রশ্ন ও বিষয়বস্তুর ধরণ পরিবর্তনে যা ধারাবাহিকভাবে ঘটতে থাকে। আপনি সর্বদা তার থেকে কিছু প্রশ্নবোধক বাক্য শুনবেন। যেমন: কী? তার অবস্থান কোথায়? কিভাবে এটি ঘটল? কোথা থেকে সে আসলো? এটি কী? সেটি কী? তুমি কি জানো? ইত্যাদি। তার মনোযোগ আকর্ষণ করে এমন সবকিছু সে জানতে চায়। যা দেখে যা শুনে সকল কিছু বুঝতে চায়। প্রদত্ত উত্তর কখনও বুঝতে পারে আবার কখনও বুঝে আসে না। তাকে প্রশ্ন করলে কোন কোন ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় নেয় উত্তর দেয়ার জন্য। আবার কখনও ঝটপট উত্তরটা দিয়ে ফেলে।

শিশুদের এক অন্যন্য বৈশিষ্ট্য হল তারা জানতে ভালোবাসে। পরিবেশ-পরিস্থিতি ও সুযোগের আলোকে তাদের জানার এ আকাংখা বৃদ্ধি পায়। এজন্য শৈশবে আমাদের করা প্রশ্নের সাথে আজকের শিশুদের প্রশ্ন মেলালে আমরা অভিভূত হই। কারণ স্থান কালের প্রভেদ ঘটেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। শিশুর প্রশ্নের জগত প্রশস্ত বা সংকীর্ণ হওয়াটা নির্ভর করে অভিভাবকের গৃহীত শিক্ষানীতির উপর। অভিভাবক যখন শিশুর ছোড়া সব প্রশ্নকে সাদরে গ্রহণ করবে এবং তার প্রশ্নের জগতকে অবারিত রাখবে, তখন সে মনের রাজ্যের গহীনে অবগাহন করবে। পক্ষান্তরে, অভিভাবক যদি শিশুর প্রশ্ন সহ্য করতে না পারে, গ্রাহ্য না করে অথবা তাকে ধমক দিয়ে চুপিয়ে দেয়, তাহলে সে আদৌও কোন প্রশ্ন করার সাহস করবে না। আমরা সবাই একমত যে, একজন শিশুর সবকিছু জানা কল্যাণকর নয় বা এটি গ্রহণযোগ্যও নয়। এতদসত্ত্বেও সন্তানদের জীবনে প্রভাব ফেলে এমন কোন বিষয়ে প্রশ্ন করতে যেন তারা ভয় না পায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখাটা খুবই জরুরী। সন্তানদের যেন এ অনুভূতি না জন্মায় যে, তারা উপস্থিত থেকেও অনুপস্থিত বা তারা বিশ্বস্ত নয়- এ বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখা সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এর চেয়েও দরকারি বিষয় হল: শিশুরা পরিবারের সাথে কথা বলতে যেন সাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

শিশুরা বেশি বেশি
প্রশ্ন করে কেন?

কারণ:

১. শিশুর কোন কিছু জানা বা উদঘাটনের আগ্রহ, তার বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের যে চাহিদা রয়েছে সেটি পূরণের একটি মাধ্যম।

২. চারপাশের সবকিছু বুঝা বা জানা শিশুর প্রয়োজন।

৩. সবকিছু দেখে তারা ভয় পায়। কারণটা খুবই সাধারণ; পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকা। যেমন: প্রাণী দেখে সে ভয় পায়। আক্রমন না করলেও। এজন্য সে বেশি বেশি প্রশ্ন করে নিরাপত্তাবোধের তাড়না থেকে।

৪. শিশুর ভাষাগত সক্ষমতার বিকাশ সাধন। সে যখন একটার পর একটা প্রশ্ন করতে থাকে, তখন এতে উত্তর পাবার আশা যতটা না থাকে তার চেয়ে বেশি থাকে ভাষা চর্চার আগ্রহ, সক্ষমতা প্রকাশের পুলক আর সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহনের প্রয়োজনীয়তা।

৫. পিতা-মাতা ও সন্তানের মাঝে আবেগপূর্ণ যোগাযোগের সুযোগ।

৬. নিজের এবং পিতা-মাতার প্রতি আস্থার বিকাশ সাধন।

শিশুর
প্রশ্নের ধরন:

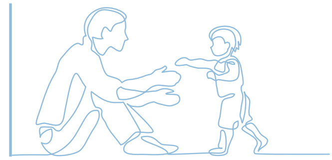

শিশুদের প্রশ্ন সঠিকভাবে বুঝার জন্য তাদের প্রশ্নের ধরন বুঝতে হবে- কোনটি বুদ্ধিবৃত্তিক প্রশ্ন, কোনটি ভাষাসংক্রান্ত প্রশ্ন আর কোনটি মনোবৃত্তিক প্রশ্ন। প্রথম প্রকার প্রশ্নের মাধ্যমে শিশু কোন কিছু জানার বা জানানোর চেষ্টা করে। দ্বিতীয় প্রকার প্রশ্নের ক্ষেত্রে আত্মিক প্রশান্তিই মূখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। উত্তর পাওয়াটা এখানে গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রতিটি প্রশ্নের নিশ্চিত একটি প্রেক্ষাপট রয়েছে- এই বুনিয়াদী বাস্তবতা নিশ্চিত হওয়া জরুরী। কোন প্রশ্নের মান নির্ণয় করা, তা বুঝা বা তার অর্থ নির্দিষ্ট করা সম্ভব নির্ধারিত পেক্ষাপটের আলোকে, যা শিশুকে এই প্রশ্নের দিকে ধাবিত করেছে। শুধু প্রশ্ন শুনে তার গুরুত্ব অনুধান করা যায় না। এর জন্য আবশ্যক যে পরিবেশ পরিস্থির আলোকে প্রশ্নটি করা হয়েছে তা বুঝা। শিশুদের প্রশ্নের গুরুত্বপূর্ণ তিনটি গঠনমূলক কাজ রয়েছে। যথা:

১. শিশুর মানসিক ভারসাম্য নিশ্চিতকরণ। তাদের অনেক প্রশ্নই হয়ে থাকে মানসিক কারণে।

২. উদ্ভাবনী চিন্তা করা। যেখানে শিশু লব্ধ তথ্যের উপর ভিত্তি করে নতুন কিছু জানার চেষ্টা করে।

৩. তার চারপাশের পরিবেশ এবং জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর সাথে পরিচিত হওয়া। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: শিশুর যাপিত সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিমন্ডলের চারিত্রিক মূল্যবোধগুলো জানা।

শিশুদের
প্রশ্নের প্রকারভেদ:

শিশুদের ছোড়া প্রশ্নগুলো শ্রেণীবিন্যাস করার উপকারিতা হলো: শ্রেণীবিন্যাসের ভিন্নতার আলোকে প্রশ্নগুলোর উত্তরও ভিন্ন হবে। তাদের প্রশ্নগুলো কয়েক প্রকারে ভাগ করা যেতে পারে। যথা:

১. ভাষার রঙয়ে মোড়ানো প্রশ্ন। উদাহরণস্বরূপ: এই জিনিসগুলো এই নামে ডাকা হয় কেন? কেন নাম পরিবর্তন করি না? অন্য ভাষা উদ্ভাবন করি না কেন? ইত্যাদি।

২. অস্তিত্বজ্ঞাপক প্রশ্ন। এর আওতাভুক্ত প্রশ্ন হল: আমরা কোথা হতে এসেছি? আমরা আবার কোথায় ফিরে যাবো? সন্তান কীভাবে হয়? মরণ মানে কী? পৃথিবী জিনিসটা কী? ইত্যাদি।

৩. বিদ্রোহাত্মক প্রশ্ন। এ প্রশ্নগুলো একটি চিন্তাকেন্দ্রিক। তা হল: বড়দের জন্য অনুমোদিত বিষয়গুলো শিশুদের জন্য নিষিদ্ধ কেন? এগুলো বড়দের অনুকরণের প্রচেষ্টা থেকে বেশি হয়ে থাকে। এখানে প্রশ্নের রূপটা লোপ পায়।

৪. পরীক্ষামূলক প্রশ্ন। এই প্রশ্নগুলো পরিবাবের সক্ষমতা পরীক্ষার জন্য শিশু করে থাকে। আবার পরিবারের দুর্বল দিকের সমালোচনা থেকেও এ ধরনের প্রশ্ন এসে থাকে। সাধারণত এই ধরনের প্রশ্ন পরিবারের অর্থিক ও দৈহিক সক্ষমতাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়।

৫. শিশুসুলভ উৎকণ্ঠামূলক প্রশ্ন। অনেক সময় শিশুরা এমন কিছু প্রশ্ন করে, যাতে তাদের নিকট বর্ধিত উৎকণ্ঠা ফুটে উঠে। পিতা-মাতার অনুপস্থিতিতে সৃষ্ট উৎকণ্ঠা হতে সর্বাধিক উৎকণ্ঠাবাচক প্রশ্ন উচ্চারিত হয়ে থাকে।

৬. শারীরিক উদঘাটনমূলক প্রশ্ন। নারী-পুরুষের শারীরিক পার্থক্য জানতে চাওয়া- এই ধরনের প্রশ্ন।

এই শ্রেণীবিন্যাস পরিবারকে শিশুদের ছোড়া প্রশ্নের প্রেক্ষাপট বুঝতে সহায়তা করবে। তারা শুধু শুধু প্রশ্ন করে না। বরং কোন কিছু বুঝতে চেষ্টা করার তাগাদা থেকেই করে থাকে– এটি অনুধাবন করতে সহায়তা করবে।

পিতা-মাতা কেন শিশুদের প্রশ্ন উপেক্ষা করে!?

শিশুদের প্রশ্ন উপেক্ষা করা কিংবা এতে বিরক্ত হওয়ার কারণ, প্রশ্নের উত্তর না জানা, প্রশ্নের গুরুত্ব না বুঝা বা প্রশ্ন উপেক্ষা করায় শিশুর মানসিক ক্ষতি সম্পর্কে অবগত না থাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং অন্য আরও কারণ রয়েছে। উল্লেখযোগ্য কিছু হল:

১. আরে, এতো মারাত্মক প্রশ্ন!, ধ্যাৎ, এটা কোন প্রশ্ন হল? এই..টাতো অন্তসারশূণ্য প্রশ্ন– শিশুদের প্রশ্নের ব্যাপারে বড়দের এ ধরনের অনুভূতির ফলে তারা তাদের প্রশ্নকে গুরুত্ব দেয় না। তাদের প্রশ্নের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। ফলে সরলতা ও স্পষ্টতায় ভরা শিশুদের নিজস্ব চিন্তা পদ্ধতির অধিকারকে বড়রা হরণ করে। পাত্তা দেয় না। স্বীকারও করে না। নিজেদের চিন্তারীতিকে তারা শিশুদের উপর চাপিয়ে দিতে চায়। তারা ভুলে যায় যে, জানার আন্তরিক আগ্রহ নিয়েই শিশু তার সারল্যেভরা প্রশ্নটি করেছে। বা এই প্রশ্ন করে সে তার চারপাশের জগতকে আবিষ্কার করতে চায়। কোনো অবস্থার প্রেক্ষাপটে হারিয়ে যাওয়া মানসিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে চায়।

২. শিশুদের করা প্রশ্নটি বড়দের নিকট দূর্বোধ্য ঠেকে। যখন প্রশ্নটি নির্দিষ্ট সংস্কৃতির আওতায় সামাজিক বা নৈতিকভাবে নিষিদ্ধ কোন বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হয়। কিংবা বয়সের একটা চৌহদ্দি পেরোনোর আগে এ ধরনের প্রশ্ন অনুমোদিত না হয়ে থাকে। শিশুদের দূর্বোধ্য এবং অস্বস্তিকর প্রশ্ন তাই বড়দেরকে ফাঁপরে ফেলে দেয়। এজন্য এ ধরনের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়ার জন্য বড়দের সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

৩. শিশুদের বেশি বেশি প্রশ্নের কারণে বিরক্ত হয়ে বড়রা অনেক সময় তাদের প্রশ্ন এড়িয়ে যায়। বড়রা যদি মানসিকভাবে শিশুদের প্রশ্নের গুরুত্ব বুঝত, তাহলে তাদের অবস্থান ভিন্ন হত। তারা তাদেরকে অধিক হারে প্রশ্ন করতে উৎসাহ দিত। প্রশ্ন করা হতে বিরত রাখত না।

৪. শিশুরা প্রত্যক্ষ প্রশ্নের তুলনায় পরোক্ষ প্রশ্ন বেশি করে। বড়রা শিশুদের প্রশ্নকে এড়িয়ে যাওয়ার এটিও অন্যতম একটি কারণ।

৫. শিশুর জানতে চাওয়া বিষয়টি না জানার কারণে পিতা-মাতা কখনও কখনও তার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হতে বিরত থাকে। আমরা তাদেরকে বলবো: আপনার সন্তানের প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে। এবং তাকে এর উত্তর দিতে হবে আন্তরিকতা এবং আমানতদারিতার সাথে।

৬. অনেক সময় শিশুরা এমন প্রশ্ন করে যা তাদের বয়সীদের থেকে অপ্রত্যাশিত। তাদের ব্রেনের সক্ষমতার সীমাকে অতিক্রম করে। এগুলোর উত্তরও অনেক দূর্বোধ্য, মোটেও সহজ নয়। ফলে পিতা-মাতা চিন্তা করে, শিশুর মাথায় এ প্রশ্ন আসল কোথা থেকে। আর এর উত্তর দিতেও অবহেলা করে।

শিশুর প্রশ্নকে পিতা-মাতা কিভাবে গ্রহণ করবে ?

পিতা-মাতার দায়িত্ব শিশুদের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেয়া এবং শিশুদের ঈমান বিষয়ক জিজ্ঞাসা নিয়ে তাদের সাথে পারস্পারিক আলোচনা ও পর্যালোচনার পদ্ধতি প্রস্তুত করা। দ্বীন সম্পর্কে তাদের চিন্তা-ভাবনা প্রকাশে সহায়তা করা। এর মাধ্যমে তারা শিশুদের মাঝে দ্বীনের সঠিক বুঝ বপন করতে পারবে। দ্বীন নিয়ে তুষ্টি ও আত্মপ্রশান্তির ফোয়ারা বইয়ে দিতে সক্ষম হবে। ফলে দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি বা অবহেলা করা হতে শিশুরা বেঁচে যাবে। রক্ষিত হবে তাদের দ্বীনী ভারসাম্য। শিশুদের দ্বীনী প্রশ্নের সব সঠিক উত্তর জানা বাবা-মায়ের জন্য জরুরী নয়। তবে শিশুদের নিকট ঈমানের স্তম্ভগুলোর ব্যাখ্যা উপস্থাপন করতে হবে, যাতে তারা আল্লাহর প্রতি শক্তিশালী ঈমান নিয়ে বেড়ে উঠে। কতই না ভালো হয়! যদি বাবা-মা বড় ভাইদেরকে শিশুদের প্রশ্নগুলো লিখে রাখার দায়িত্ব দেয়। বড় ভাইয়েরা এতে দ্বিমত করবে না। বরং তারা সাদরে এই দায়িত্ব গ্রহণ করবে। এতে তারা মজাই পাবে। বিশেষত তাদেরকে প্রণোদনা দেওয়া হলে। এতে করে কয়েক দিক থেকে পিতা-মাতা লাভবান হবেন। ১. বড় সন্তানদের অন্তরে প্রশ্নের গুরুত্বের বীজ বপন করা যায় আর এটি গুরুত্বের দাবীও রাখে। ফলে তারা প্রশ্ন করে। ২. ভবিষ্যতে যখন তারা পিতা-মাতা হবে, তখন তাদের সন্তানদের প্রশ্নকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করার মানসিকতা তৈরী করা যায়। ৩. পিতা-মাতার নিকট কতগুলো প্রশ্ন জমা হয়, যা সেগুলোর উত্তর খুঁজতে সহায়তা করে। এবং পরবর্তী ভাই-বোনদের কী ধরনের প্রশ্ন হতে পারে তা অনুমান করতে সহায়ক হয়। আবার এর জন্য প্রস্তুতি নিতে সাহায্য করে। শিশুর পূর্বের কোন প্রশ্নের উত্তর দিলে সে যারপর নাই খুশি হয়। শিশুদের প্রশ্নগুলোর সুন্দর উত্তরের

প্রতি গুরুত্ব দিলে আল্লাহ চাহে তো এর বিরাট প্রভাব তার উপর পড়বে। সাথে সাথে তার সাথে আমাদের সম্পর্কেও প্রভাব পরিলক্ষিত হবে। আগত বছরগুলোতে পিতা-মাতাকে শিশুর জ্ঞানের প্রধান ও বিশ্বস্ত উৎস বানিয়ে দিবে। ফলে সে বয়োসন্ধিকালে সন্দেহজনক উৎস হতে জ্ঞান আহরণ করবে না।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। বাবা-মাকে এটির ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে। তা হলঃ শিশুর বিশেষ দুই ধরনের প্রশ্নের পার্থক্য নির্ণয় করা। প্রথমত. সনির্বন্ধ প্রশ্ন। শিশু বারবার যেগুলো আওড়িয়ে থাকে বলে আমরা অনুধাবন করি। পরিবারের একাধিক ব্যক্তির নিকট সে এ প্রশ্নগুলো তুলে ধরে। আবার এ থেকে অন্য কিছু প্রশ্নের জন্ম হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত. আকস্মিক প্রশ্ন। তার সাথে চলমান আলোচনার প্রসঙ্গ পরিবর্তন হলে সে তা ভুলে যায়। প্রথম প্রকার প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের পরিচায়ক নয়। বরং আমরা উত্তর দিতে চেষ্টা করবো, অথবা এর উত্তর খুঁজবো, বা নিজেরা না পারলে যে সুন্দর উত্তর দেয় তার সহায়তা নিবো। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রশ্ন এড়িয়ে গেলে সমস্যা নেই। বিশেষত এমন বিষয়ে প্রশ্ন হলে যার উত্তর শিশু হজম করতে পারবে না।

শিশুর প্রশ্নের সাথে আচরণের মূলনীতিসমূহ

শিশুর প্রশ্নের উত্তর প্রদানকালে বাবা-মাকে কতগুলো মূলনীতি ও মূল্যবোধ মেনে চলতে হবে এবং এগুলোর প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। যথা:

১. **শিশুর অনুভূতির প্রতি সম্মান দেখানো:** বাবা-মা শিশুর প্রশ্ন কান পেতে শ্রবণ করবে। আর জানাবে যে, তারাও তার চিন্তা-উদ্বেগের অংশীদার। তার প্রশ্নগুলোর প্রতি সম্মান দেখাবে। যথাযথ মূল্যায়ন করবে সেগুলোর। এই অংশীদারিত্ব শিশুর মানসিক ভারসাম্য ও আত্মপ্রশান্তি ফিরিয়ে দিবে। আমরা দ্রুতই দেখবো তার আত্মবিশ্বাসের জোর, প্রশ্নের যথার্থতা এবং আলোচনা পথে যৌক্তিক ধারাবাহিকতা।

২. **আত্মবিশ্বাস ও নিরাপত্তা:** শিশুর প্রশ্নের উত্তর প্রদানের সময় বাবা-মাকে দু-একটি বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে খুব গুরুত্বের সাথে। এক. উত্তরে তার পরিচিত শব্দমালা ব্যবহার করতে হবে। দুই. তথ্যগুলো তার সহজবোধ্য করে দিতে হবে। উত্তর প্রদানে আন্তরিকাতার অর্থ হল স্থিতি, আত্মবিশ্বাস এবং মানসিক নিরাপত্তাবোধ নিশ্চিত হওয়া।

৩. **শিশুদের যেসব বিষয় তাড়িত করে সেগুলো বিবেচনায় রাখা:** শিশুদের যাপিত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপট হতে উদ্ভূত তাড়না সৃষ্টিকারী বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে। যেমন: পরিবারে নতুন শিশুর আগমনে সে উদ্বেগ বা বিরক্তি বোধ করে। সুধায়: শিশুরা কোথা হতে আসে? শুধু তাত্ত্বিক উত্তরে তার এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। বরং তাকে এ প্রশ্ন ছুড়ে দিতে তাড়িত করেছে যে বিষয়, সেটির চিকিৎসা প্রয়োজন। সাথে বিশেষ গুরুত্ব প্রদানও করা চাই।

ছোটদের জন্য বড়দের সবচেয়ে বড় উপহার হল আকলকে আলোকিত করতে সহায়তা করা। কেস্‌সা-কাহিনী বর্ণনা করে বা সঠিক জ্ঞান বিতরণের মাধ্যমে নয়। বরং তাদেরকে চিন্তা গবেষণার ট্রেনিং দিয়ে, বিভিন্ন প্রস্তাবনা পেশ করে, বাহ্যিক বিষয়গুলোর জ্ঞানে তুষ্ট না থাকার অভ্যাসে অভ্যস্ত করে, এই বাহ্যিকতার অন্তরালে যা রয়েছে তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে উদ্বুদ্ধ করে। ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখানো উচিত। আলোচনা হতে হবে গঠনমূলক। কথাবার্তা এবং মতবিনিময় উদ্দেশ্যমূলক হওয়া চাই। বড়দের আরও যা করতে হবে তা হল: কিছু প্রশ্ন করা যা শিশুদের চিন্তা করতে প্রণোদনা দিবে।

প্রশ্নের উত্তর প্রদানের বিষয়টি আরও ভালোভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে। পারিবারিক বৈঠকে বাবা-মা শিশুকে একটি প্রশ্ন করতে বলবে। তারপর প্রশ্নটি গভীর ও স্পর্ষকাতর না হলে সবার জন্য উত্তরের ক্ষেত্র উন্মুক্ত করে দিবে। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে, শিশুর প্রশ্নের সরলতা নিয়ে বড়রা যেন তাকে উপহাস না করে। এমনটি ঘটলে বাবা-মা শিশুর পক্ষাবলম্বন করে তার সাহসিকতার উচ্ছসিত প্রশংসা করবে। সবার প্রশ্ন করার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করবে। সাথে সাথে এটাও স্মরণ করিয়ে দিবে যে, আমাদের সবারই জ্ঞান অতি নগন্য। কুরআনের ভাষায় শোনা যাক- **'এবং তোমাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে সামান্যই'**। (সুরা আল-ইসরা-৮৫)

দলীয় উত্তরপ্রদানে আমরা অনেকগুলো উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে পারবো যার ভূমিকাতে থাকবে শিশুদের প্রশ্ন করতে অভ্যস্ত করানো।

কথোপকথন এবং আলাপচারিতার মাধ্যমে প্রতিপালন ও শিক্ষাদান:

শিশুদের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি হল প্রশ্নোত্তর ও বদানুবাদভিত্তিক আলোচনা পদ্ধতি। কারণ এটি জিহ্বার জড়তা কাটাতে সহায়তা করে। ভালো ফল দেয় দক্ষতা অর্জনে। কথোপকথন তারবিয়্যার কাজটি সহজ করে দেয় আর এর উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তা করে। তবে কথপকথনের সময় শিশু যেন অনুভব করে যে, তাকে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। এটি শিশুকে এবং তার আবেগ অনুভূতিকে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, ভয় এবং মানসিক দ্বন্দ্ব হতে মুক্ত করবে। কথোপকথনের সময় শিশু যখন মানসিক প্রশান্তি অনুভব করবে, তখন সঙ্গীর কাছে প্রাণ খুলে তার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এবং সমস্যাদি তুলে ধরতে পারবে। উভয় পক্ষই যখন সমস্যা চিহ্নিত করে মন খুলে কথা বলবে, তখন শিশু মনের সবকিছু ব্যক্ত করতে পারবে। সমাধানের পথ সহজ হয়ে যাবে। সফলতার হারও এখানে অনেক বেশি হবে।

শিশু এবং বাবা-মার মাঝে আলাপচারিতা পরিবারে কতগুলো উপকার বয়ে আনে। যেমন: ১. পারস্পারিক পরিচিতি: শিশু পরিবাবের অবশিষ্ট সদস্যদের নিকটবর্তী হয়। ২. পারস্পারিক হৃদ্যতা: আলাপচারিতা পরিবারের সদস্যদের মাঝে হৃদ্যতা বৃদ্ধি করে। তৈরী হয় ভালোবাসার আবহ। ৩. পারস্পারিক বিনম্রতা: আমরা আলাপচারিতা হতে আনুষ্ঠানিক পরিবেশই কেবলমাত্র চাই না। বরং মধুর বাক্যে এবং মনোরম পরিবেশে আলাপচারিতার মাধ্যমে এর উদ্দেশ্য সাধন হওয়া চাই।

পূর্বের আলোচনা হতে আমরা পেলাম আলাপচারিতার মাধ্যমে প্রতিপালন ও শিক্ষা-দীক্ষা কর্মটি কয়েকটি বিষয়ে বিশিষ্ট। যথা:

১. এটি শিশুকে একাকী বস্তুর বাস্তবতা উদ্ঘাটন এবং চিন্তার স্বাধীনতা দেয়। এতে তার সৃজনশীলতা নতুন গতি পায়। বিকাশ ঘটে তার ব্যক্তিত্বের।

২. এটি একটি সাবলীল পদ্ধতি যাতে নেই কোন কৃত্রিমতা। একজন শিশু স্বাচ্ছন্দে এটিকে গ্রহণ করতে পারে। কোন প্রকার লজ্জাবোধ থাকে না।

৩. এটি ছোটদের মনকে আনন্দে নাচিয়ে তোলে। ব্যক্তিত্ববোধ জাগিয়ে দেয়। অন্যদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে শেখায়।

৪. এটি স্বতন্ত্র চিন্তা ও গবেষণার সুযোগ করে দেয়। ফলে শিশু সব বিষয়কে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে। যৌক্তিক চিন্তা-ভাবনায় তাকে অভ্যস্ত করে তোলে।

৫. এটি শিশুর চেতনাকে জাগিয়ে দেয়। বিভ্রম ও অবসাদ থেকে দূরে রাখে। তাড়িত করে প্রতিক্রিয়া দেখাতে এবং আন্দোলিত হতে।

কথোপকথনমূলক প্রশ্নের গঠন:

এ ধরনের প্রশ্নেগুলো বিভিন্ন আঙ্গিকে শিশুর নিকট উত্থাপন করা যায়। যেমন:

- (مَاذَا يَحْدُثُ কী ঘটবে?) এই প্রশ্নরূপটি শিশুকে তার চারপাশের ঘটমান বিষয়াদি নিয়ে অনুসন্ধানে উৎসাহিত করে। চোখে দেখা ঘটনাবলীতে মনের ভাব সরাসরি ব্যক্ত করতে সহায়তা করে।

- (مَاذَا تُرِيدُ কী চাও? কী দরকার? কোন প্রয়োজন আছে কি?) এটি তাকে তার প্রয়োজনগুলো নির্ধারণে সাহায্য করে।

- (كَيْفَ تَفْعَلُ هَذَا এটি কীভাবে করবে?) এটি তাকে স্বাধীন চিন্তায় সহায়তা করে। উত্তর খুঁজতে তার কল্পনাকে প্রণোদনা দেয়।

- (لِمَاذَا يَحْدُثُ هذَا এটি কেন ঘটল?) এটি বাহ্যিক বিষয় এড়িয়ে কারণ খুঁজতে তাকে সহায়তা করে। ফলে সে সকল বস্তুর মধ্যকার সম্পর্ক তালাশ করতে শুরু করে।

- (مَاذَا سَنَفْعَلُ لَوْ حَدَثَ كَذَا এমনটি ঘটলে আমরা কী করবো?) এটি শিশুকে বিষয়গুলো নিয়ে দ্বিতীয়বার ভাবতে শেখায় নতুন করে।

এ ক্যাটাগরীর যে প্রশ্নগুলো শিশুকে করা যায় তা বিভিন্ন প্রকার হয়। কিন্তু প্রত্যাশিত ফল দিবে, এমন ভালো প্রশ্নের কতগুলো বৈশিষ্ট রয়েছে। যথা:

১. প্রশ্ন যথাসম্ভব ছোট হওয়া।

২. প্রশ্ন সুস্পষ্ট এবং এক চিন্তা কেন্দ্রিক হওয়া।

৩. প্রশ্ন শিশুর বয়স, স্থান, কাল এবং পাত্রের সাথে সংগতিপূর্ণ হওয়া।

৪. প্রশ্নটিতে সঠিক-বেঠিক উভয়টির সম্ভাবনা না থাকা। বরং এমন হওয়া যা শিশুর ব্রেনকে আন্দোলিত করে এবং তার দিগন্তকে বিস্তৃত করে। এমনভাবে যা তার জন্য উত্তর কল্পনা করার সুযোগ রাখবে।

শিশুপ্রশ্নের উত্তর প্রদানের পদ্ধতি

শিশুর প্রশ্নের প্রকারভেদ, এর ধরন এবং এতদ সংশ্লিষ্ট আরও কিছু বিষয়ের আলোচনা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। এখানে আমরা উত্তর নিয়ে কথা বলবো। স্থান, কাল এবং পাত্রভেদে শিশুদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান ভিন্ন ভিন্ন হবে। কিছু বহুল প্রচলিত পদ্ধতির আলোচনা করা যাক:

১. **সরাসরি মৌখিক উত্তর:** এটি বহুল প্রচলিত পদ্ধতি। শিশু প্রশ্ন করে আর পরিবারের কোন সদস্য মৌখিক উত্তর প্রদান করে। অধিকাংশক্ষেত্রে এই উত্তর হয় দ্রুততার সাথে এবং সংক্ষিপ্ত।

২. **গল্পে গল্পে উত্তর:** উত্তর দানের এটি পরোক্ষ পদ্ধতি। এক্ষেত্রে গল্পটি হতে হবে পেশকৃত প্রশ্নের প্রকৃতির সাথে সংগতিপূর্ণ। সাধারণত শিশুরা এ ধরনের উত্তরের পছন্দ করে থাকে। প্রবল আগ্রহ নিয়ে কান পেতে শ্রবণ করে।

৩. **চিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে উত্তর:** কোন কোন সময় শিশুরা এমন প্রশ্ন করে, যার উত্তরের জন্য কিছু চিত্র ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। যেমন: বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন; যেখানে চিত্র বা ছবি শিক্ষার প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। বিশেষত সেটি রঙ্গিন এবং চিত্তাকর্ষক হলে।

৪. **অবলোকনের মাধ্যমে উত্তর:** কখনও কখনও শিশু এমন প্রশ্ন করে, যার প্রাক্টিকাল উত্তর তাকে উত্তরের স্থানে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে দেওয়া সম্ভব। বাস্তবে বিষয়গুলো অবলোকন করা এবং তা হতে উত্তর বের করার জন্য। যেমন: সে জানতে চাইল পরিবেশের প্রাণী জগত সম্পর্কে। তাদের জীবনধারা কেমন? তাদের খাদ্যাভ্যাস কী? কীভাবে তাদের বংশ বিস্তার ঘটে? ইত্যাদি। তখন তাকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে গিয়ে সরাসরি অবলোকনের মাধ্যমে উত্তর খুজতে সহায়তা করা যেতে পারে।

উত্তরদানকালে যে সাধারণ নির্দেশনাগুলো লক্ষ্য করা উচিত:

১. আলোচনা-পর্যালোচনা, প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়া এবং ব্যাখ্যা জানতে চাওয়া-ইত্যকার পদ্ধতিগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে শিশুকে তুষ্ট করতে আগ্রহী হন। নিরস শিক্ষাদান পদ্ধতির উপর নির্ভরশীলতা পরিহার করুন। উত্তর শেষ হলে নিশ্চিত হতে হবে শিশু এ উত্তরে পরিপূর্ণ সন্তুষ্ট হয়েছে কি না।

২. উত্তর প্রদানে আন্তরিক হন। অসুবিধা থেকে পালাতে গিয়ে শিশুকে মিথ্যা তথ্য দেওয়া পরিহার করুন। পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন শিশুর নিকট ভুল তথ্য যেন না যায়, সে বিষয়ে সতর্ক হন। মনে রাখবেন, সঠিক এবং বাস্তব উত্তর আপনার প্রতি আপনার শিশুর আস্থা বহুগুণে বাড়িয়ে দিবে।

৩. উত্তরটি সহজকরণের চেষ্টা করুন। যাতে সহজে বুঝে আসে এবং ছোটদের বুঝশক্তির সাথে সংগতিপূর্ণ হয়। শিশুর ব্রেনে গন্ডগোল পাকায় এমন দূর্বোধ্য উত্তর পরিহান করুন। লক্ষ্য রাখুন, শিশু এখনও ছোট আছে বা সে ভালোভাবে বুঝতে পারবে না, এই যুক্তিতে সে যেন অসম্পূর্ণ তথ্য না পায়। কারণ এই তথ্যগুলো তার ব্রেনে আঠার মত এঁটে বসবে।

৪. শিশুর প্রতি এমন আচরণ করবেন না যেন সে নির্বোধ। সঠিক পদ্ধতি ব্যবহার হলে আপনার প্রত্যাশিত তথ্য ধারণ করতে সে সক্ষম হবে। কোন প্রকার বিকৃতি না ঘটিয়ে তার প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করুন। যাতে শিশু বিষয় বহির্ভূত কোন গোলকধাঁধায় না পড়ে।

৫. প্রশ্ন যেমনই হোক এজন্য শিশুকে ভর্ৎসনা করবেন না, হাসির পাত্র বানাবেন না বা ধমক দিবেন না। বরং তার যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর প্রদানে আপনি সদা প্রস্তুত এমন বার্তা তাকে দিন। উপহাস শিশুকে দুর্বল করে ফেলবে। আত্মবিশ্বাসহারিয়ে ফেলবে। ভাটা পড়বে নতুন কিছু জানার ভালোবাসায়।

৬. স্রষ্টার অস্তিত্বকে কল্পনা করতে না পেরে তাঁর সম্পর্কে শিশুর বিভিন্ন অভিনব প্রশ্নে উদ্বিগ্ন হবেন না। তার প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া হতে নিজেকে গুটিয়ে নিবেন না। তাহলে সে অন্য অনিরাপদ উৎস হতে তথ্য খুঁজতে প্রবৃত্ত হবে।

৭. উত্তর খুঁজার জন্য সময় চাইতে দ্বিধাবোধ করবেন না। একজন গবেষক হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করা মূর্খ জ্ঞানের দাবিদার হিসেকে জাহির করার চেয়ে অধিক উত্তম। 'অপেক্ষা কর, আমি তোমার জন্য সঠিক উত্তর খুঁজছি'– শিশুকে এ কথা বলা দোষের কোন বিষয় নয়।

৮. শিশুদের জিজ্ঞেসাবাদকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করুন। মনোযোগ দিয়ে সেগুলো শ্রবণ করুন। অবহেলা করবেন না বা এড়িয়ে যাবেন না। মানসিক এবং বাস্তবিকভাবে শিশুকে আলিঙ্গন করলে, আপনার দেওয়া তার নিকট দুর্বোধ্য বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা সে গ্রহণ করবে।

৯. সত্যিই আপনি ব্যস্ত হলে তাকে কোমলভাবে বুঝান, বাবা! এই সময়টা তোমার প্রশ্নের উত্তরের জন্য উপযুক্ত নয়। আমার ব্রেনটা অন্যদিকে ব্যস্ত আছে। ব্যস্ততা শেষ হলে ঝটপট তার প্রশ্নের উত্তরটা দিয়ে ফেলুন।

১০. অপ্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা বা বিশদ বিবরণ পরিহার করুন। ছয় বছরের শিশুর উত্তর দশ বছরের শিশুটির চেয়ে সংক্ষিপ্ত হবে। এই পদ্ধতি সেসব প্রশ্নের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেগুলোর উত্তরের জন্য যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন প্রয়োজন বা গভীরতায় যাওয়া চাই। যেমন: অদৃশ্যের বিষয় সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলো। তবে কিছু প্রশ্ন আছে, যার উত্তর নির্ধারিত এবং সব বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

১১. প্রশ্নের উত্তরগুলো যথাসম্ভব শিশু বুঝতে পারে এমন বাস্তব বিষয়ের সাথে জুড়ে দেন। এই বয়সে বুঝতে কষ্ট হয়, এমন একক বিষয় উপস্থাপন হতে বিরত থাকুন। সম্ভব হলে উত্তরগুলো যুক্তি দিয়ে সাজাতে চেষ্টা করুন, যা তথ্যগুলোকে শিশুর নিকট জোরদার করবে।

১২. কোন তথ্য উপস্থাপনে পিতা-মাতার ঐকমত্য খুবই জরুরী। তাদের মতের অমিল শিশুকে সে তথ্য গ্রহণে ধাঁধায় ফেলবে।

১৩. শিশুর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তাকে উল্টো প্রশ্ন করা যাবে না। যেমন: বাবা তার প্রশ্নের জবাবে বলল: (তুমি কী বোঝাতে চাচ্ছ?)। এক্ষেত্রে শিশু হতাশা বোধ করবে। কারণ সে বাবার কাছে প্রশ্নটা পৌঁছাতে পারে নি। শিশুদের বিশ্বাস বাবা-মা তাদের কথা কোন ব্যাখ্যা ছাড়াই বুঝতে পারবেন। পিতা-মাতা শিশুর প্রশ্ন নিশ্চিত হতে চাইলে, স্বীকৃতিবাচক বাক্য ব্যবহার করে বলবে: তুমি এটি বুঝাতে চেয়েছে মনে হয়। তাই না?

১৪. শিশুর নির্দিষ্ট কোন প্রশ্নের জবাবে বাবা-মা নিজেদের মতামত তার উপর চাপিয়ে দিবেন না। অনেক সময় শিশু ভিন্ন কোন উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করে। কিন্তু পদ্ধতিটি বাবা-মার মত নয় বরং অন্য পদ্ধতিতে। এই অবস্থায় সহজ-সরল ও সাবলীল পদ্ধতিতে সঠিক উত্তর দিয়ে তাকে তুষ্ট করতে হবে। তাহলে বাবা-মার প্রতি তার আস্থা ফিরে আসবে।

১৫. চেষ্টা করুন, উত্তর যেন লেকচারের স্টাইলে না হয়ে আলাপচারিতার আদলে হয়। বেশি বেশি উদাহরণ দিন। গল্পের স্বাদ আস্বাদন করান। ছবিযুক্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকোষের ব্যবহার বাড়িয়ে দিন। তাহলে খুব সহজে শিশুর ব্রেনে ভাবটা পৌঁছে যাবে। গতিশীল গেইম, অভিনয়, চিত্রাকন, চিন্তায় অভ্যস্তকরণ, আবৃত্তি, ব্রেইন স্টরমিং, চিন্তাশক্তিকে নাড়া দেয় এমন খেলাধূলা, কপি, পেস্ট, চিত্রায়ণ ইত্যাদি বিষয়গুলো সময়ে সময়ে ব্যবহার করুন। ভিন্নতা শিশুর চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটাবে আর তথ্যগুলো গেঁথে দিবে তার ব্রেনের গভীরে।

১৬. কিছু প্রশ্নের উত্তর একবারে দেওয়া যায় না। বরং অল্প অল্প করে ক্রমান্নয়ে দিতে হয়। বেশি জানতে চাইলে বয়স, প্রশ্নের ধরন এবং বুঝের মাত্রানুযায়ী উত্তর বেশি করতে হবে।

১৭. শিশু যখন বড় হবে এবং কিছুটা পক্ক বয়সে উপনীত হবে, তখন কৃত প্রশ্নের ব্যাপারে তার নিজস্ব অভিমত চাওয়া ভালো হবে। তার প্রশ্নটা তাকেই করবো। এতে কেমন প্রতিক্রিয়া দেখায় তা জানার জন্য। তার এই প্রতিক্রিয়া থেকে আমরা উত্তরের সূচনা করতে পারি। শিশুদের বোধশক্তি আর আমাদের বোধশক্তির ফারাক আসমান-যমিনের মত। তাই আমাদের বোধশক্তি নিয়ে তাদেরকে চিন্তা করতে বাধ্য করতে পারি না। এ ধরনের চেষ্টা হতে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। কারণ এতে তার ব্রেনে চাপ পড়বে। বড় ধরনের ক্ষতির আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

উত্তর প্রদানের সময়
শিক্ষা সংক্রান্ত ভুলসমূহঃ

উত্তর প্রদানের সময় শিক্ষা সংক্রান্ত যে ভুলগুলো আমরা করে থাকিঃ

- শিক্ষা-দীক্ষার বিভিন্ন দিকগুলোর প্রতি লক্ষ্য না রাখা। ঈমানী দিক রয়েছে। আছে চারিত্রিক দিক। ইলমী দিকটাও বিদ্যমান। ভুলটা হচ্ছে, একটির প্রতি জোর দিয়ে অন্যটি একেবারেই ছেড়ে দেওয়া। অথবা সবগুলোর মাঝে সমন্বয় না করা।
- শিক্ষা-দীক্ষায় ধারাবাহিকতা রক্ষা না করা। বেশি বেশি তিরস্কার ভৎসনা করা। অবহেলার অপবাদ দেওয়া ইত্যাদি।
- শিশু প্রতিপালনে বিশেষজ্ঞ এবং অভিজ্ঞদের পরামর্শ না নেওয়া। এক্ষেত্রে দ্রুততার নীতি গ্রহণ করা। ভালোভাবে লেগে না থাকা।
- 'উচ্চবাচ্য না করে কায়মনোবাক্যে আমাদের কথা মেনে নিতে হবে'- এমন মনোভাব লালন করা।
- দূর্বোধ্য নির্দেশনা দেওয়া। আমাদের কথা-কাজে মিল না থাকা। ধ্বংসাত্মক নেতিবাচক বার্তা দেওয়া।

এই সবগুলোই ভুল যা শিশুর মানসিকতায় ঈমানী গঠনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

শিশুর ঈমান বিষয়ক প্রশ্নের উত্তরের বাস্তবিক কিছু নমুনা

এই আলোচনায় বর্ণিত উত্তরগুলোর লক্ষ্য প্রথমত পিতা-মাতা এবং শিশুদের প্রশ্ন মোকাবেলা করে যে সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা, নির্দেশনাদাতা, সংস্কারক তারা। তাদের নিকট আমাদের আবেদন, তারা যেন শিশুর বয়স, জ্ঞানের স্তর এবং সক্ষমতার সাথে সংগতি রেখে উত্তরের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে নেন। কারণ আমরা বয়স, বুদ্ধি ও সক্ষমতাভেদে বিভিন্ন স্তরের শিশুদের জন্য একটি উত্তর প্রণয়ন করতে পারবো না। এজন্য আমাদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ হল, উত্তরের প্রকৃত অবস্থা ও এর নির্যাস। শব্দের অক্ষরগুলো আমাদের নিকট মূখ্য নয়। অনুরুপ উত্তরের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় ধরনের সম্মোধন থাকবে। এতে করে আমরা সম্মানিত পাঠকের সামনে সর্বোচ্চ পরিমাণ চিন্তার খোরক তুলে ধরতে পারবো। সে নিজ ভূমিকায় এই উত্তরগুলোর নির্যাস গ্রহণ করবে এবং নতুন করে সাজিয়ে নিবে তার শিশুর জন্য উপযোগী পদ্ধতিতে।

ঈমানের অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট শিশুর প্রশ্নের উত্তর প্রদানের জন্য পিতা-মাতার নূন্যতম শারয়ী জ্ঞান থাকতে হবে। অন্তত আল্লাহ-রাসূল, ফিরিশতাকুল, জান্নাত জাহান্নাম ইত্যাদির প্রাথমিক বুনিয়াদি জ্ঞান রাখা জরুরি। কেননা, কখনও ঈমানের বিষয়ে তো বটেই, সময়ে অসময়ে গায়েবের মতো জটিল জটিল দৃশ্য ও প্রশ্নও শিশুদের মাথায় ঘুরপাক খায়। যাতে দ্বীনের প্রাথমিক জ্ঞাত বিষয়গুলো তারা শিশুর নিকট পৌঁছাতে পারে। তাদের সামনে ব্যাখ্যা করতে পারে অদৃশ্যের বিষয়গুলো তাদের বুঝ এবং যোগ্যতার সাথে সংগতিপূর্ণ ভাষায়। অভিভাবকরা সাধারণত যেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেন তা কেবলমাত্র তথ্যের প্রাচুর্যতার মধ্যে সীমিত নয়। বরং তথ্যগুলো শিশুর বোধগম্য এবং তার ব্রেনের গ্রহণযোগ্য মোড়কে তৈরী করাটাও চ্যালেঞ্জ। স্থান কাল পাত্রের সাথে সংগতিপূর্ণ পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা আরও বড় চ্যালেঞ্জ।

আগত অধ্যায়গুলোতে আমরা শিশুদের মুখে বারবার উচ্চারিত হয় এমন কিছু প্রশ্নের নমুনা উপস্থাপন করবো। তবে এগুলোই যে তাদের মাথায় আসা সকল প্রশ্ন বিষয়টি এমন নয়। বরং এগুলো সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং বারবার এগুলোর পুনরাবৃত্তি হয়। আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি, আমাদের দৃষ্টিতে সর্বোত্তম উত্তরগুলো বাছায়ের। আমরা দাবী করছি না যে, এগুলোই কেবলমাত্র আদর্শ উত্তর। এগুলো কিছু নমুনা মাত্র, যার মাধ্যমে অভিভাবকরা সূচনা করতে পারবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। এগুলোতে নিশ্চিতভাবে সংযোজন-বিয়োজন এবং পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা যাবে।

সর্তকীকরণ:

যার ধারণা, শিশুদের এসব স্রষ্টা ও সৃষ্টি নিয়ে অবোঝপনা প্রশ্নোত্তর হিতে বিপরীত হতে পারে। সংশয় ও দ্বিধাদন্ধের শিকার হতে পারে। এটুকু বয়সেই স্রষ্টার অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব নিয়ে ভাবাভাবি তাদের কাজ নয়– সে ভুলের মধ্যে রয়েছে। শিশুর এই অবস্থাটি তার সুস্থ-স্বাভাবিকতার বাহ্যিক লক্ষণ হিসেবে বিবেচিত। যা বলে দেয়, শিশুর বিকাশ স্বাভাবিক আছে এবং তার চিন্তা আর বোধশক্তিতে যৌক্তিক ধারাবাহিকতা বিদ্যমান। ত্রুটি যদি পাওয়া যায়, তাহলে তা অভিভাবকদের অক্ষমতার মধ্যে রয়েছে। তারা শিশুর বিকাশ উপলব্ধি করতে পারে না। উন্মুক্ত করতে পারে না তার জ্ঞানের দিগন্তগুলোকে। প্রস্তুত করতে পারে না তাকে চারপাশের জগতের যাবতীয় উপাদান গ্রহণ করবার জন্য।

তাই পিতা-মাতা এবং যারা শিশুদেরকে সামলানোর দায়িত্ব পালন করে, তাদেরকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে সন্তোষজনক উত্তর পেশ করার। মোটামুটি একটা পর্যায়ে হলেও চলবে। আংশিক সন্তোষজনক উত্তর শিশুকে মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সামাজিকভাবে স্থির থাকতে সহায়তা করে। অন্যদিকে বিকৃত উত্তর বা ভুল প্রতিক্রিয়া শিশুর বিক্ষিপ্তভাব এবং হতবুদ্ধিতা বাড়াতে ভূমিকা রাখবে। আর এই দুটি বিষয় তার আচারণে অস্থিরতা সৃষ্টি করবে। বয়ে আনবে চিন্তার বিকৃতি।

বড় সমস্যা একবারে তৈরী হয় না। ক্ষুদ্র একটি আগুনের ফুলকি থেকে আগুনের সূত্রপাত ঘটে। তাই মানুষের অনেক খারাপ গুণ ক্ষুদ্র বীজদানা আকারে আরম্ভ হয়। সেটিকে অবহেলা করা হয় আর দূর করতে কালক্ষেপণ করা হয়। অজ্ঞতার ভান সেটিকে পানির যোগান দেয়। ফলে তা বিকশিত হয়ে বেড়ে ওঠে। মনের ভেতর শিকড় গজায়। পরিশেষে তা পরিপক্ক হলে তার মূলোৎপাটন দূরহ হয়ে দাঁড়ায়।

আল্লাহর প্রতি ঈমান নিয়ে শিশুদের করা প্রশ্ন (ও তার উত্তর)

শিশুদের মাঝে, বিশেষত উঠতি বয়সে যে সকল অজানা বিষয়ে জানার আগ্রহ থাকে, প্রশ্ন করা শিখে, তন্মোধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস ও ঈমান হলো অন্যতম। এখানে শিশুরা পিতা-মাতাকে এ বিষয়ে সবচে বেশি যে প্রশ্নগুলো করে থাকে সেগুলো তুলে ধরা হলো:

? আল্লাহ তা'আলা কে?

শিশু আল্লাহ সম্পর্কে কখন জানতে চাইবে, এই প্রতিক্ষায় বসে থাকা আমাদের উচিত হবে না। বরং সর্বদা প্রতিটি মোক্ষম উপলক্ষ্যকে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে আলোচনার আসর বানাতে অগ্রগামী হতে হবে। আল্লাহ এবং তাঁর গুণাবলী বিষয়ক শিশু জিজ্ঞাসার সঠিক উত্তর তার মন-মস্তিস্কে আল্লাহর প্রতি ঈমান আর তাওহীদের বিশ্বাসকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে। এজন্য সর্বোত্তম পন্থা হলো: (১) শিশু যেন আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়ে চিন্তা না করে। বরং তাঁর অস্তিত্ব নির্দেশক নিয়ামাতরাজি, বিস্ময়কর সৃষ্টিজগত নিয়ে চিন্তা করে- সেটি নিশ্চিত করা। যেমন: আসমান, মেঘপুঞ্জ, নক্ষত্রমালা, সূর্য, চন্দ্র, সমুদ্র, বৃক্ষরাজির মত বিস্ময়কর সৃষ্টি যা আল্লাহর অস্তিত্ব নির্দেশ করে। (২) আল্লাহ তা'আলা তাকে এবং তার চক্ষুদ্বয়, কর্ণদ্বয়, মুখমন্ডল, জিহ্বা, হস্তদ্বয়, পদদ্বয়, এবং শরীরের সব অঙ্গ-প্রতঙ্গ সৃষ্টির মাধ্যমে তার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন- এই নির্দেশনা দেওয়া। আমরা তাকে বলবো: এই যে আসমান দেখছো না, এটি আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন! এই যে যমিন এটিও তাঁরই সৃষ্টি! এই যে কত নয়নাভিরাম বৃক্ষরাজি! এগুলোও কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বানিয়েছেন। এভাবে বলতে থাকলে এই শব্দগুলোর সাথে সে পরিচিত হবে, এগুলোর সাথে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। যখন সে প্রশ্ন করবে আল্লাহ কে? সরল উত্তরে আমরা বলবো- আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে সবকিছু যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই আল্লাহ। এ বিষয়ে আমরা তাকে প্রচুর উদাহরণ দিবো।

এভাবে যখন তার সামনে এই ধরাপৃষ্ঠ ও উর্ধ্বলোক নিয়ে কথার পর কথা দিয়ে মালা তৈরী করে বোঝানোর চেষ্টা করা হবে; অত্যন্ত জ্ঞান ও বিচক্ষণতার সাথে, তখন তার সামনে খুলে যাবে পর্দার অড়ালের নিগূঢ় সব জটলা ও সংশয়। কথোপকথনের আদলে আমরা এগুলো আরও স্পষ্ট করে দিতে সক্ষম হবো, ইনশা আল্লাহ। যেমন:

- বাবা দেখো, এই যে সাজানো গোছানো পৃথিবী ও তার মানুষ- কত নিখুতভাবে তৈরী করা! কে সৃষ্টি করেছেন জানো? তিনি হলেন, আল্লাহ।

- সুবহান অল্লাহ!

তাঁর নাম ও গুণাবলীগুলো আরও সুন্দর। তিনি পরম দয়ালু। তিনিই দাতা। তিনি আমাদের সর্বদা ভালোবাসেন। আমাদের জন্যে মঙ্গল কামনা করেন।

- তিনি শিশুদের ভালোবাসেন। আর চান, আমরা বড়রা তোমাদের আদর-যত্ন করি। শিক্ষা-দীক্ষায় বড় করে তুলি। আমাদের কর্মের ভালো মন্দের হিসাব রাখেন। সে হিসেবে প্রতিদানও দেন। তুমি সদাচার করলে তাঁর কাছে লোভনীয় পুরস্কার পাবে। আবার মন্দকর্মের জন্যে সাজাও ভোগ করা লাগবে। তিনিই একমাত্র ইবাদত ও বন্দনার হকদার। তাঁর সাথে কোন প্রকার অংশিদার সাব্যস্ত করা যাবেনা।

-ঠিক আছে বাবা?

- ইনশা আল্লাহ।

সবচে ভালো হয়, ছোট্ট ছোট্ট সূরা-অবলম্বনে তাকে মহিয়ান গরিয়ান সত্তার পরিচয় করিয়ে দেওয়া। **আপনি বলুন, তিনি আল্লাহ এক অদ্বিতীয়। তিনি তো অমুখাপেক্ষী। অথচ সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি সন্তানের অধিকারী নন। কারোর সন্তানও তিনি নন। আর তাঁর মতো দ্বিতীয় কেউ নেই।**

আচ্ছা বাবা বলো তো, তোমার জন্য সুন্দর চকচকে জামার সেট কে কিনে দিয়েছে?

-আব্বু তুমি।

- তোমাকে দৈনন্দিন স্কুলে মাদরাসায় কে নিয়ে যায়?

-তুমি।

আবার যখন অসুস্থ হও; জ্বর মাথা ব্যথ্যা, তখন কে তোমাকে ডাক্তারের কাছে নেন?

-তুমিই তো।

-ছুটির দিনেও কি আমি তোমাকে নিয়ে পার্কে ঘুরতে বের হই?

- হু।

আচ্ছা, তবে আমিই আল্লাহর তাওফিকে তোমার সব আশা আকাঙ্খায় পাশে থাকি। তাই না?

-জ্বি।

- দেখ, আমি বা তোমার বাবা যেমন তোমার দেখভাল করেন, যত্ন নেন- যখন যেটার প্রয়োজন। ঠিক তেমনি আল্লাহ তা'আলাও আমাদের সর্বদিকে চিন্তা-ফিকির করেন, দেখাশুনা করেন।

তিনি সব কিছুর স্রষ্টা। এই পাহাড়পর্বত, মেঘরাজি, সমুদ্রের জলরাশি, পাখ-পাখালি, জীবজন্তু সর্বোপরি জ্বীন ইনসান- স-অ-অ-অব তাঁর কুদরতের বহিঃপ্রকাশ।

আল্লাহর আকার আকৃতি কেমন (আল্লাহ কি আমাদের মতোই)?

না, তিনি আমাদের মত নন। আল্লাহর মত কোন কিছু নেই। তিনিই আমাকে তোমাকে সমগ্র মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। বৃক্ষরাজি, নদ-নদী, সমুদ্র এবং দুনিয়ার সব কিছু তিনি পয়দা করেছেন। এই প্রশ্নের উত্তরের আগে বোঝা দরকার মানুষের দুর্বলতা ও স্রষ্টার স্বয়ংসম্পূর্ণতার ব্যাখ্যা।

-মানুষ চাইলেই কি ছুমন্তর ছু বলে কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে? মানে এক নিমিষে কোন সময় ক্ষেপণ ছাড়াই! আর সে কি কোন কালে মানুষ সৃষ্টি করতে পেরেছে- **'হও আর আপনা-আপনি হয়ে যাবে'**- এমন যাদুতে? না। কিন্তু আল্লাহ্ চাইলেই মুহূর্তেই সব করতে পারেন। বলেনঃ কুন ফায়াকুন- যা খুশি তাই হয়ে যায়। আজীব না?

-সুবহান আল্লাহ! সত্যিই আজীব। যেহেতু দুনিয়ার চক্ষু দিয়ে তাঁকে দেখা সম্ভব নয়, তাই কারো পক্ষে তাঁর অবয়ব বর্ণনা করা অসম্ভব। তাঁর নূরের তাজাল্লিতে আমরা তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারবো না। **স্রষ্টা-দর্শন বিষয়ে তাকে নিয়ে প্রয়োজনে একটি পর্যবেক্ষণ করা যায়।**

- চলো আজ বাহিরে সূর্য দেখি। তোমার কাজ হলো, একটানা সূর্যের আলোর দিকে তাকিয়ে থাকা। চোখ বন্ধ করা যাবেনা কিন্তু একদম। এক পলকও না।

–আচ্ছা।

–কি, সূর্য্যের কিরণ ও প্রভাতে (আলোতে) তাকানো যাচ্ছে?!

- ওহহ! একদম না।

- হ্যাঁ বাবা, আল্লাহর সরাসরি দর্শনলাভও ঠিক তেমনিই। তাঁর পবিত্র সত্তা থেকে যে আলোকচ্ছটা বের হয়ে আসে, সেটা মানুষের সাধ্য নেই ধারণ করার। কিন্তু পরপারে, জান্নাতে ইনশা আল্লাহ তাঁকে দেখার সুযোগ থাকবে।

হয়তো শিশুর এত তথ্য-উপাত্ত মাথায় ধরবেনা। ঘুরেফিরে ঐ এক কথা, আল্লাহ কেন অন্য কিছুর সাথে মিলছে না!?

-আসলে বাবা, মানুষ যতই বড় হোক, জ্ঞানে গুণে তার জানা শোনার পরিধি একচিলতে পরিমাণই থাকবে। যতটুকু আল্লাহ তাকে জানাতে চান, শিখাতে চান ততটুকুই সে জানবে ও শিখবে। বাদবাকী সবই অজানা থেকে যাবে। তাই মানুষের দিনশেষে সবকিছুর জ্ঞানী ও জান্তা বনে যাওয়া সম্ভব না।

চিন্তা করে দেখ তো, মানুষের মাঝে যে আত্মা, যেটার গুণে সে বেঁচে আছে, সেই আত্মার অবয়ব গঠন প্রকৃতি কি আমরা কল্পনা করতে পারি? নির্দিষ্ট করে বলতে পারি-আত্মা এমন অথবা অমন?

-না।

-তাহলে বুঝো, যেখানে আমরা নিজেদের অস্তিত্বের খবরই রাখিনা, যেটার গুণে আমি তুমি বেঁচে আছি। সেখানে বাকী বাহিরের জগতের আর কতটুকুর জ্ঞান রাখি, বলো?

-তাই তো!

আল্লাহকে যদি মানুষের মতো ধরা হয়, তাহলে মানুষ যেমন খায়দায়-পানাহার করে, মলত্যাগ করে, অসুস্থও হয়, মারা যায়- তার ধর্ম অনুযায়ী- আল্লাহরও তাহলে খাওয়া দাওয়া করতে হতো। সেই খাবার খেয়ে অসুস্থ হতে হতো। আবার মৃত্যুবরণও করতে হতো। কিন্তু না, তিনি খানাদানা, আহার্য ইত্যাদির উর্ধ্বে। তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। এই সাত তবক আসমান যমীন এগুলো সৃষ্টির আগেও তিনি ছিলেন, আবার পরেও থাকবেন। কিছুটা পরিষ্কার হয়েছে, বাবা?

- জ্বি, আলহামদু লিল্লাহ।

মানুষ সীমাবদ্ধ ও দুর্বল প্রকৃতির। শোনাতেও দুর্বল, অবলোকনেও দুর্বল; তাই চারপাশের খুব সামান্যই আমরা চোখে দেখতে পাই, খুব অল্পই শুনতে পাই। আমরা যদি সব শুনতেও পেতাম, তাহলে কেমন যে অসুস্থ হয়ে পড়তাম, তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। চারিদিকে শুধু শব্দ আর শব্দ! আবার খেয়াল করো, এই দেয়ালের পাশে কী আছে তা খোলাচোখে দেখতে পাও? না।

একই কথা আমাদের জ্ঞানের ব্যাপারে। খুব অল্পই আমরা জানি। যেদিন আল্লাহ তা'আলা মানব সৃষ্টি করেছেন সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের অজানার তুলনায় জানার পরিমাণ খুবই কম।

? এতক্ষণ তো শুধু কল্পনা-জল্পনা দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে, আল্লাহর আকৃতি কেমন?

এসব কিন্তু তাঁর অবয়ব ও আকৃতি বোঝার ক্ষেত্রে মাপকাঠি নয়। মহান সত্তার অবয়ব এসব দিয়ে হবে না। বুঝতে হবে কুরআন সুন্নাহর আলোকে, এবং সে অনুপাতে অক্ষরে অক্ষরে মানতেও হবে। দেখো, এক কথায় কুরআন কী বলে, **'তিনি কোন কিছুর মতো নন। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা'**। (সূরা শুরা-১১)

? কে তাহলে আল্লাহকে সৃষ্টি করলো?

আল্লাহকে যদি কেউ সৃষ্টি করে থাকে তাহলে পাল্টা প্রশ্ন আসে ঐ স্রষ্টাকে কে সৃষ্টি করলো? এরপর ঐ স্রষ্টাকে আবার কে সৃষ্টি করল? চলতেই থাকবে- অন্তহীনভাবে। তাই এমন প্রশ্নই অবান্তর ও অহেতুক। তোমাকে কেউ যদি বলে ত্রিভূজেরর চতুর্থ রেখার মাপ বলো তো? তাহলে প্রশ্নের কোন আগামাথা পাবে?

–না।

–অর্থাৎ উত্তর করতে পারবেনা। কারণ, একটি ত্রিভূজের তিনটি দণ্ড বা রেখা হয়। এমন প্রশ্ন আসল অর্থেই বোকামী ও নির্বুদ্ধিতার পরিচয় বহন করে। একই কথা স্রষ্টাকে সৃষ্টি করার প্রশ্নে। কেননা, স্রষ্টা তিনিই যিনি কারও সৃষ্ট নন, কখনও তাঁকে সৃষ্টি করা সম্ভব না। সৃষ্টিকর্ম শুধুমাত্র সৃষ্টিজীবের উপর প্রয়োগ হয়। তিনি শুধুই সৃষ্টি করে যাবেন। বাকি সব তাঁর অনুগত বাধ্যগত সৃষ্টি। তাঁকে উপাসনা করতে বাধ্য।

আবার আরেকটি কথা। তিনি যদি অন্য কারোর সৃষ্টি হন, তাহলে তাঁর আদেশ আমরা পালন করতাম না বৈকি। ইবাদত উপাসনাও করতাম না। কারণ তিনিও সৃষ্টি আমিও সৃষ্টি! কিন্তু বাস্তবে তা নয়। তিনি আদি-অনন্তের অধিকারী, কেউ তাঁর উপর সৃষ্টিকর্ম চালায়নি।

তার মানে, যিনি সবকিছুর মালিক খালিক তাঁকে এক ও অদ্বিতীয় হওয়া লাগবে। বিষয়টি একটি উদহারণ দিয়ে বুঝি।

ধরো, একজন সৈন্যকে বলা হলো, তুমি বন্দুক দিয়ে গুলি ছুড়বে, তবে শর্ত হলো- গুলি চালানোর আগে তোমার পিছনে অবস্থানকারী সৈনিকের অনুমতি নিতে হবে। পরেরজনেরও জবানবন্দি নেওয়া হলো, সামনের ব্যক্তিকে অনুমতি দিতে পারবেনা, যতক্ষণ না তোমার পিছনের জনের কাছে অনুমতি পাবে! সে আবার তার পরেরজনের অনুমতির মুখাপেক্ষী! এভাবে একে একে চলতে থাকবে, যার কোনও শেষ নেই। তাহলে বলো তো, বন্দুকের গুলি কি আর ছোঁড়া হবে? প্রথম যে সৈনিক, তার একক সিদ্ধান্ত ও ক্ষমতার অভাবেই এমনটা হলো। মানে যদি একক কারোর অধীনে গুলি ছুড়ার দায়িত্ব থাকে, কোন সীদ্ধান্তহীনতা ছাড়াই গুলি চালাতে পারবে।

কিন্তু এই **'একক'** ব্যক্তিটি ছাড়া বন্দুকের টোটা নলি থেকে বের হবে না, সে যতজনই আসুক না কেন। অনেকটা মৌলিক সংখ্যা বাদে হাজার বার শূন্য কষার মতো। ভাবো, তোমার এখান থেকে দূরের মসজিদ পর্যন্ত যদি শূন্যর পর শূন্যযুক্ত করো, যতদূর পারা যায়, যুক্ত করো- শেষমেশ এসবের কিন্তু চারআনা মূল্য হবেনা; যতক্ষণ না তার পূর্বে 'এক' বসাবে।

হ্যা, তিনিই সেই একক সত্তা। আল্লাহ॥

আল্লাহ্ কোথা থেকে আসলেন। তাঁর বয়স কতো?

আগের শিরোনামে জানা গেল, আল্লাহ্ সকল কিছুর স্রষ্টা। তিনি কারোর সন্তানও না, আবার কারো পিতাও নন। আমাদের মতো তাঁর শুরুও নেই, শেষও নেই। চিন্তা করলেই বোঝা যায়, তাঁর প্রতি মরা বাচাঁর মতো দুর্বল গুণগুলি সম্পৃক্ত করা অমার্জিত অপরাধ। কেননা তিনি দুর্বলতা থেকে বহু উর্ধ্বে। সকল কল্যাণ ও মঙ্গলের আধার। সুন্দর ও গুণসম্পন্ন নামগুলি তাঁরই জন্যে বরাদ্দ। অতএব যেই সত্তা সব কিছুর বিধাতা ও সবের উর্ধ্বে যার অবস্থান তাঁকে 'জন্মমৃত্যুর' বাটখারায় মাপা যায়না। তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু রাজাধিরাজ।

আল্লাহর পূর্বে তাহলে কার রাজত্ব ছিলো? (আল্লাহর পূর্বে কে ছিলেন?)

এটিও পূর্বে আলোচিত প্রশ্নেরই একটি নতুনরূপ। তার উত্তরও একদম জানা। তিনি স্থান কাল পাত্রের উর্ধ্বে (সময়ের আগেও যেমন ছিলেন, পরেও তেমন আছেন)।

সঠিক নিরীক্ষণে সময় ও স্থান কি আল্লাহর সৃষ্টি থেকে আলাদা কিছু? না। যেখানে সৃষ্টি স্রষ্টার উপর বড়াই করতে পারেনা, সেখানে তো নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, কোন স্থান কাল ও পাত্র আল্লাকে ধারণ করতে পারেনা। একদমই না। কেননা ঐ একই কথা, তিনি লাইসা কামিসলিহি শাই...। তিনি সমস্ত সুন্দর গুণের অধিকারী।

এখানেও আমাদেরকে কুরআনের বাণীতে ফিরে যেতে হবে। তিনি বলেন- **'তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই জাহের, তিনিই বাতেন এবং তিনি সর্ববিষয়ে অধিক অবহিত'**। (সুরা আল-হাদীদ, আয়াত নং-৩)

হাদিসের পাতায় নববী একটি আদর্শ পাই। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, আবু হুরাইরা রাযি.। চলো শুনা যাক তার মুখ থেকেই– **'আল্লাহর রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন। শয়তানের কুকর্ম দেখো, তোমাদের কাছে এসে ফিসফিস করে বলে, এটা কে সৃষ্টি করেছে, ওটা কে সৃষ্টি করেছে? এভাবে কানপড়া দিতে থাকে, শেষে বলে- আচ্ছা তবে তোমাদের আল্লাহকে কে সৃষ্টি করল? আল্লাহর রাসূল বলেন, কেউ এপর্যন্ত এলে সে যেন অবশ্যই ইস্তেগফারের অজিফা গ্রহন করে। এবং এমন কুমন্ত্রণা থেকে মুক্ত হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করে; এসব থেকে বিরত থাকে'**। (বোখারি, হাদিস নং-৩২৭৬)

তবে ইস্তিগফারের নির্দেশ এজন্যে নয় যে, এগুলোর কোন উত্তর নেই। এখানে মূল বিষয় হলোঃ উত্তর দিতে হবে, তবে অপ্রয়োজনীয় ও অবিবেচনামূলক প্রশ্ন করে কোন গর্তে পড়ে যেন তার বিশ্বাসের প্রাচীরে চিঁড় না ধরে- সেই দিকটাকে প্রাধান্য দিতে হবে। ইস্তিগফারেও এক প্রকার বুঝ প্রদান করা যায়। বিচক্ষণ অভিভাবক মাত্রই এমনতর নাযুক ও স্পর্শকাতর বিষয় সযত্নে বোঝাবেন, অন্যথায় ভিন্ন আলোচনায় শিশুর মননজগতে ঈমান চর্চা করবেন।

? তিনি কি নারী না পুরুষ?

শিশুর চিন্তার গতিপ্রবাহ যেন সর্বদা ইতিবাচক হয়, সময় ও শ্রম পণ্ড করে এমন অবিবেচনামূলক প্রশ্ন তাকে আরও হয়রান করে তুলবে, কাজের কাজ কিছু হবে না। যে প্রশ্নোত্তর ইতিবাচক মনে হবে তাকে সেসব প্রশ্নে উদ্বুদ্ধ করা সময়ের দাবী।

- দেখো, একটি জিনিস খেয়াল করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। উদাহরণ দিবো, তবে আগে কুরআনের ঐ আগের বাণীটি মুখস্ত আছে তো?

-হুম, লাইছা কামিললিহি শাই..

-হ্যাঁ, সকল ক্ষেত্রেই মূলত ঐ এক ঔষুধ। তাঁকে কোন কিছুর সাথে মিলালে চলবেনা। তবে একটি জিনিস ভাবো, এই নর-মাদি ও নারী-পুরুষের বিভাজনটা মূলত জীবজন্তুর বংশ টিকানোর লক্ষ্যে কাজ করে। মানুষের সন্তান আর অন্যান্য জীবজন্তুর প্রজনন সংরক্ষণ হয়। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেন- **'আর তিনিই সৃষ্টি করেন জোড়ায় জোড়ায় পুরষ ও নারী'**। (সূরা আন-নাজম, আয়াত নং- ৪৫)

এক কথায় নারী-পুরুষ। কিন্তু আল্লাহকে একই মাপে মাপা যাবেনা। এখানেও তিনি লিঙ্গ পরিচয়ের ঊর্ধ্বে। ফিরিশতারাও লিঙ্গ পরিচয়হীন। শুধু কি তাই, আমরা মানুষ্য-জাতি ব্যতীত পুরোজাহানে আরও অনেক সৃষ্টি আছে যেগুলোর কোন লিঙ্গ পরিচয় জানা যায়নি। যেমন, নদ-নদী, আসমান, সূর্য, পানি, বাতাস ইত্যাদি। এগুলোকে তো নারী-পুরুষ দিয়ে বিবেচনা করা বোকামি। তাহলে বুঝে আসে যে, যেখানে দুর্বল সৃষ্টির গুটিকতক শ্রেণীর ক্ষেত্রে যদি এটা বলা না চলে যে– এটা নারী-মেঘ, ওটা পুরুষ-পানি ইত্যাদি, তাহলে তো আল্লাহ তা'আলার ব্যাপাটা আরও স্পষ্ট, মানে তিনি এই বিভাজনের ঊর্ধ্বে। **লাইসা কামিসলিহি শাই যার পরিচয়**- তাঁকে লিঙ্গ দিয়ে পরিচয় করা নিরর্থক ও গোস্তাখি। (আসতাগফিরুল্লাহ্)

আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ কী? কোন প্রমাণের ভিত্তিতে স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করবো?

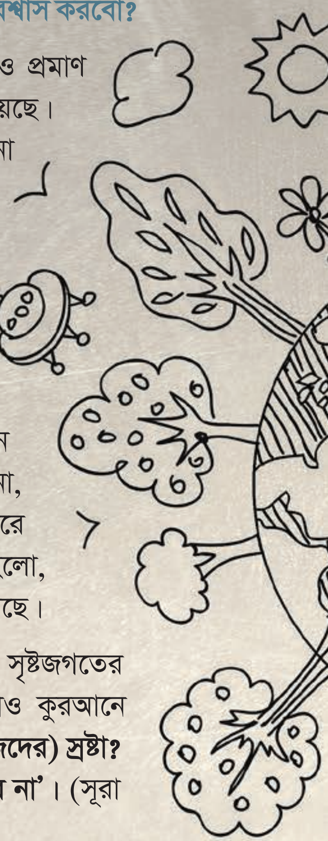

আল্লাহর প্রতি ঈমান স্বভাবজাত ও ফিতরাতী বিষয়। আল্লাহর অস্তিত্বেও প্রমাণ অসংখ্য ও অগণিত। এছাড়া আরও বহু প্রমাণ অতীত বর্তমানে প্রকাশ পেয়েছে। মানুষও যে যার ক্ষেত্রে রব প্রদত্ত দক্ষতা দিয়ে সৃষ্টির নেপথ্যের অজানা অধ্যায়গুলো এক এক করে আবিষ্কার করেই চলেছে। আমাদের গঠন-অবয়বেই যেটা অঙ্কিত আছে। আপন সত্তায় একটু অনুসন্ধানী মনে খুঁজলেই তাঁর প্রতি বিশ্বাস ও অগাধ ভালোবাসার সাড়া পাওয়া যায়। এগুলো কিন্তু আল্লাহ আমাদের জানিয়েছেন। চলো না, শুনে আসি রবের ভাষায়- **'এটাই আল্লাহর ফিতরাত (প্রকৃতি) যার উপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন'।** (সূরা আর-রূম, আয়াত নং- ৩০) যদি খোঁজ করা হয়, মহাজগত কোন্ নিখুঁতগুণের ভূমিকায় সৃষ্ট তাহলে তিন রকমের ধারণা আসে। হয়, কোন কার্যকারণ ছাড়া কাকতালীয়ভাবে হঠাৎ ঘটে গেছে। এরপর কেউ জানেনা, এসব কীভাবে হলো? তারপর থেকে চলছে তো চলছে। অথবা এও হতে পারে যে, সে নিজে নিজে অস্তিত্ব ধারণ করেছে! এটা একটা (কু)যুক্তি। আরেকটি হলো, নাহ্, এই নিখুঁত ও অনিন্দ্যসুন্দর সৃষ্টির পিছনে নিশ্চয় কোন পরিচালক আছে।

তিনটি ধারণার প্রথম দুটি যুক্তিতে খাটেনা। তাই তৃতীয়টিই চূড়ান্ত যে, এ সৃষ্টজগতের পিছনে অদৃশ্য কোন শিল্পীর নিখুঁত ছোঁয়া অবশ্যই আছে। এ আলোচনাও কুরআনে এসেছে: **'তারা কি কোন কিছু ব্যতীতই সৃষ্ট হয়েছে, না তারা নিজেরাই (নিজেদের) স্রষ্টা? নাকি তারা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? বরং তারা তো বিশ্বাস করে না'।** (সূরা আত-তুর, আয়াত নং- ৩৫,৩৬)

আল্লাহর অস্তিত্বের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কিছু প্রমাণ হলো: তিনি বান্দাদের দু'আ কবুল করেন, আসমান-যমিন সৃষ্টির নিপুণতা ইত্যাদি। সৃজনকর্মের কথা প্রমাণ করে- এরকম বহু উদাহরণ উল্লেখ করা যায়। সবকিছুই এক সত্তার অস্তিত্বকে প্রমাণ করে। আরও মজার ব্যাপার হলো, সৃষ্টির পরতে পরতে এমন সব উপমা ও নিদর্শন আল্লাহ তা'আলা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছেন যে, একটু চোখ-কান খোলা রাখলেই তাঁর অস্তিত্বের হাতছানি পাওয়া যায়। সবকিছুই বলে দেয় তিনি এক ও অদ্বিতীয় মা'বুদ। আর আমরা সকলে শুধুই তাঁর ইবাদতগুজার বান্দা, তাঁর বন্দেগীই যার লক্ষ্য উদ্দেশ্য।

আসমান-যমীন সৃষ্টির নিপুণতার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন, **'তারা কি কোন কিছু ব্যতীতই সৃষ্ট হয়েছে, না তারা নিজেরাই (নিজেদের) স্রষ্টা? নাকি তারা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? বরং তারা তো বিশ্বাস করে না'।** (সূরা আত-তুর, আয়াত নং- ৩৫,৩৬) আবার মানুষ সৃষ্টির নিপুণতার ব্যাপারে- **'এবং তোমাদের মধ্যেও! তোমরা কি অনুধাবন করবে না?** (সুরা যারিয়াত-২১) অনুরূপ চাঁদ, তারা, সূর্য, যানবাহন, পাহাড়পর্বত ও আপামর জীবজন্তু নিয়ে কুরআনে আরও বর্ণনামূলক উপমা এসেছে। শুধু একটু বোঝা প্রয়োজন। এবার একটি

ঘটনা শুনাই। আক্বিদায়ে ত্বহাবীর ভাষ্যগ্রন্থে ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। একদা ইমাম আবু হানিফা রহি. এর সাথে অবিশ্বাসিদের একটি বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। বিষয়: বিশ্বজাহানের অধিপতি কে? কার ইশারায় সব চলে? তাওহিদুর রুবুবিয়াহ। তিনি আলোচনা শুরু করার পূর্বে সবার কাছে একটি প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন। আর তাতেই তারা কুপোকাত।

চ্যালেঞ্জটি এরকম-

—আচ্ছা আপনারা বলুন, দজলা নদীতে একটি স্টিমার জাহাজ পাওয়া গেল, কোথাও একটি জায়গায় মাল আনতে গেল; খাবারদাবার, পণ্যসামগ্রী আরও কতকিছু। স্টিমারটি নিজেই সব বোঝাই করলো। সেগুলো নিয়ে কোন নাবিক ছাড়াই চলে আসলো। তীরে নোঙর করে আবার নিজে নিজেই সব মাল নামিয়ে আবার রওয়ানা দিলো। এসবই হলো কোন নাবিক ও ক্রু ছাড়াই! কী বলেন আপনারা?

-সবাই বললো। আরেহ্ , এ বেটা বলে কী। মাথা খারাপ নাকি? অসম্ভব।

-তখন ইমাম আবু হানিফা রহি. বললেন, এটা যদি এক স্টিমারের ব্যাপার হয়, তাহলে তোমরা সারা জাহানের ব্যাপারে কেন উল্টাপাল্টা বলো যে, পরিচালক ছাড়াই চলছে? উপরে আসমান, নিচে যমীনও কোন নিয়ন্ত্রক ছাড়াই চলছে? এমন সুন্দর পরিপাটি ছবির মতো পৃথি বীকে তোমরা বলতে চাচ্ছো কোন শিল্পীর ছোঁয়া ছাড়াই হয়ে গেছে? বড়ই হাস্যকর। তখন তাদের নাস্তানাবুদ হওয়ার দৃশ্য দেখার মতো ছিলো।

আসলে বাস্তব কথা হলো কি জানো, আমাদের যখন ক্ষুধা লাগে তখন পেট জানান দেয়- তোমার ক্ষুধা লেগেছে। মরিয়া হয়ে খাবার তালাশ করি। আবার পিপাসা লাগলেও একফোঁটা পানির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরি। জৈবিক চাহিদা শেষ হলে শারিরীক একটা তৃপ্তি আসে। সুন্দর সুঘ্রাণের কাছে এলে মনোরম সুবাসে দিল জুড়ায়, আবার মন্দ ও ঘৃণিতবস্তুর সংস্পর্শে বিরক্তি ভাব আসে। মানে পৃথিবীর সুন্দর শস্য-শ্যামল ও মায়াকাড়া প্রকৃতি আমাদের কাছে টানে। আমরা তাদের সংস্পর্শে সুখ লাভের চেষ্টা করি।

অপরদিকে, খাদ্য ও পানির তুলনায় আল্লাহর সান্নিধ্যগ্রহণ আমাদের স্বভাবজাত অভ্যাস। কেননা তাঁকে স্মরণ করে আমরা আত্মিক পরিশুদ্ধি লাভ করি, প্রশান্তি অনুভব করি। তাই দিনে রাতে তাঁকে বারংবার ডাকি; সুখেও ডাকি, দু:খেও ডাকি। নিজেদের তখন পৃথিবীর সবচে সুখী মানুষ মনে হয়। তাঁর নিরাপত্তার বলয়ে এলে সুখ ও নিরাপদ কী জিনিস তা বোঝা যায়। তাই সর্বদা তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ খুঁজে ফিরি, তাঁর বন্দনা গাই এই পৃথিবীতে।

? আল্লাহ তা'আলা কি আমাদের মতো শুনেন, দেখেন, কথা বলতে পারেন?

—হ্যাঁ, সুন্দর প্রশ্ন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা শুনেন, দেখেন, এবং কথাও বলেন। তবে, একটি কথা -আগের মতোই- তিনি তাঁর মতো, কেউই তাঁর মতো নয়। লাইছা কামিছলিহি শাই... (সূরা শুরা–১১)। তাঁর দেখা, শোনা, কথা বলা সবকিছু অনন্য ও অদ্বিতীয়। মানুষের

কথা বলাতে, দেখাতে, শোনাতে, সবকিছুতেই সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা আছে। কিন্তু বরাবরের মতো তিনি এসব সীমাবদ্ধতা থেকে পবিত্র ও মুক্ত। দেখাতে, শোনাতে, কথাতে, সবকিছুতেই।

–ও আচ্ছা।

– এবার আল কুরআনের কিছু আয়াত তোমাদের শোনাই, যাতে আমাদের কাছে তাঁর বড়ত্ব ও মহত্ব স্পষ্ট হয়। কথাবার্তায়, চলাফেরায়, ওঠাবসায় যেন খুব সতর্ক থাকার চেষ্টা করি। কেননা গোপন থেকে গোপনতর জিনিস তাঁর নজরদারিতে রয়েছে। প্রত্যেকটি আওয়াজ তাঁর কর্ণকুহরে পৌঁছে যায়। একটিও তাঁর চোখের আড়ালে নয়।

খাওলাহ্ বিনতে সা'লাবাহর ঘটনা অনেকে জানে। সেখানে আল্লাহ তা'আলা নিজের সম্পর্কে বলছেন– **'আল্লাহ অবশ্যই সেই নারীর কথা শুনেছেন, যে তার স্বামীর ব্যাপারে তোমার সাথে বিতর্ক করছিল, আর আল্লাহর দরবারেও অভিযোগ করছিল। আর আল্লাহ তোমাদের উভয়ের কথা-বার্তা শুনেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা'**। (সূরা মুজাদালাহ্, আয়াত নং- ০১) মুসা ﷺ ও তাঁর সহোদর হারুনকে যখন তিনি ফিরআউনকে দাওয়াত দিতে পাঠালেন, তারা একটু ভয় ও কাচুমাচু করছিলেন। তখন তাদের অভয় দিয়ে আল্লাহ বলেন– **তিনি বললেন : 'তোমরা ভয় কর না, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। আমি শুনি ও দেখি।'** (সূরা ত্বহা, আয়াত নং- ৪৬) অন্য সূরা হুদে বলেন– **'তোমরা যা কর্ম করে থাকো তার সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত'**। (সুরা হুদ, আয়াত নং- ১১২)

আচ্ছা, আল্লাহর কি ক্ষুধা-পিপাসা পায় না?

খানাপিনা করা মানুষের জৈবিক চাহিদা। এটা দুর্বল ও অসম্পন্নতার পরিচয়। আল্লাহ তা'আলা এসব মানবীয় গুণাবলীর ঊর্ধ্বে। **তিনি খাবার পানীয় খান**-এমন কথা অমার্জনীয়। কারণ, মানুষ বেঁচে থাকার তাগিদেই এই শাঁক-সবজি, ফলমূল, লতাপাতা খায়। সে এগুলোর উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ কোন কিছুর উপর নির্ভর করেননা। যদি করতেনেই তাহলে তাঁর ইলাহ হওয়ার যোগ্যতা লোপ পেতো। তিনি সামাদ; মানে সকল সৃষ্টিকে আমরণ তার কাছে সবকিছুতে ধরনা দিতে হবে। কিন্তু তিনি কারোর কাছে মুখাপেক্ষী নন।

আমরা তাকে আরো বলবো, সৃষ্টি ও স্রষ্টার মাঝে কোন তুলনা হয় না। আমরা যা বানাই বা আবিষ্কার করি তাকি আমাদের আকার কিংবা আমাদের গুণ বিশিষ্ট হওয়া জরুরী? আদৌও না.. এবার একটি প্রশ্ন করি। ধরো, তুমি কিছু একটা খেলনা তৈরী করলে, সেটা কি আমাদের মতো হাসতে বাধ্য, অথবা খেতে পারবে এমন? ধরো, তুমি একটি সাইকেল তৈরী করলে, অর্থাৎ তুমি এখন সাইকেল আবিষ্কারক। দুর্দান্ত।

এবার লক্ষ্য করলে, হঠাৎ তার কী ভিমরতি ধরল, তুমি যেখানে আবিষ্কারক, তোমাকে বলে বসল, আজ ভাত খাওয়া হয়েছে? তখন তোমার কেমন লাগবে?

– আমি কী খাই না খায় এসব ভাবাভাবি তার কাজ না। আর সে জেনেই বা কী করবে? আমার খবরাখবর জানলে তো খুব গতিতে চলবেনা। অহেতুক সব।

-হ্যাঁ, ঠিক ধরেছো। তার মূল কাজ হলো, সুন্দরভাবে যৌক্তিক গতিতে; তবে নষ্ট না হয়ে চলা।

–একই কথা আমাদের ক্ষেত্রেও। আল্লাহ আবিষ্কারক। আমরা তাঁর তৈরী গোলাম। যা বলবেন তাই শুনতে হবে। আল্লাহ বলেন– **'আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন ও মানুষকে এজন্যে যে, তারা একমাত্র আমারই ইবাদত করবে'।** (সূরা যারিয়াত, আয়াত নং- ৫৬)

–আচ্ছা বুঝতে পেরেছি। আলহামদু লিল্লাহ!

- কখনও সাইকেলে কোন পার্টসে সমস্যা দেখা দিলে ভিন্ন কথা। তখন মালিক চিন্তা করবে সেটা ঠিক করার। এছাড়া তোমাকে খাবার-দাবারের প্রশ্ন করা হাস্যকর ঠেকে।

একইভাবে আমরা যে ইবাদত ও উপসনার জন্যে নিযুক্ত, তা রেখে আল্লাহর খাওয়া-দাওয়া নিয়ে প্রশ্ন অনেকটা সাইকেলের প্রশ্নের মতো হয়ে যায়। এতে কাজের কাজ কিছু হবেনা। মাঝখানে শুধুই সময় নষ্ট। তাহলে ফলাফল, সৃষ্টির সাথে স্রষ্টাকে তুলনা করা অবাঞ্চনীয়।

? আল্লাহর শক্তি কতখানি?

আমরা যখন সীমিত ক্ষমতা বা সক্ষমতা নিয়ে আলোচনা করি, তখন এর অর্থ দাঁড়ায় এটি একটি ক্রটিযুক্ত গুণ। কেননা শক্তির শেষ যেখানে দুর্বলতার শুরু সেখানেই। আর দুর্বলতা একটি অসম্পূর্ণ গুণ। আল্লাহ তা'আলাকে দুর্বল গুণে বিশেষায়িত করা যায় না। এটি তাঁর শানে অনুপযুক্ত, চুড়ান্ত বেয়াদবী। এর কারণ হলো, তাঁর ক্ষমতার মাপকাঠি নেই। তিনি সকল কিছুর উপর কর্তৃত্বশীল। তাঁর শক্তি ও ক্ষমতার বলয় সীমাহীন। কোন কিছুই তাঁকে পরাস্ত করতে পারেনা; আসমানেও না যমীনেও না। যত সীমাবদ্ধতা সব বান্দার, যত পবিত্রতা ও সীমাহীন ক্ষমতা তা শুধুই তাঁর। আর এজন্যে ইবাদত পাওয়ার একমাত্র হকদার তিনিই। কোন কিছুর প্রয়োজন হলে তাঁর কাছেই চাইতে হবে। আকুতি-মিনতি জানাতে হবে তাঁর দরবারেই। স্রষ্টার অন্তহীন ক্ষমতার কথা জেনে, আমরাও বেঁচে থাকার তাগিদে খাদ্য পানীয় চাই তাঁর কাছেই। সৃষ্টিজগতের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণে সক্ষম সত্তা একমাত্র তিনিই। তিনি হলেন আশা ভরসার একমাত্র কেন্দ্রস্থল। **'তুমি কি জান না যে, আল্লাহ সর্ব বিষয়ের উপরই ক্ষমতাবান?'** (সূরা বাকারাহ, আয়াত নং- ১০৬)।

? আল্লাহ কোথায়, তাঁর আকার কতটুকু?

শিশুদের সাথে অনেক আলাপ হলো। রবের বড়ত্ব মহত্ত্ব, আমাদের প্রতি তাঁর নেয়ামতরাজি, ছোট্ট বাচ্চাদের প্রতি বড়দের মায়ার কথা, ভালোবাসার কথা হলো। আরও জানলাম- আল্লাহর লিঙ্গ পরিচয়, তাঁকে সৃষ্টির অসম্ভাব্যতা, তাঁর পানাহারের মতো জটিল কিছু বিষয় শেষ করে

এতদূর এলাম। বাচ্চার মাঝে স্রষ্টার মহিমা ও ভক্তির বীজ সামান্য হলেও তৈরী হয়েছে। এবার আরেকটি প্রশ্ন তাঁর অবয়ব ও অবস্থান বিষয়ক। তবে এখন সবচে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ঐ অদৃশ্য সত্তার পর্যবেক্ষণ শিশুর অন্তর্জগতে যত জাগিয়ে তোলা যাবে, ততই তার মধ্যে এই বোধ জাগ্রত হবে যে, আল্লাহ আমাকে দেখছেন!)

– শুরুতেই একটি গল্প। নবীর যুগের গল্প। সাহাবী মুয়াবিয়া বিন হাকাম রাযিঃ গল্পটি শুনাচ্ছেন। চলো তাহলে শুনে আসি- **'আমার এক দাসী ছিল। সে উহুদ ও জাও্ওয়ানিয়্যাহ্ এলাকায় আমার বকরীপাল চরাত। একদিন আমি হঠাৎ সেখানে গিয়ে দেখলাম, তার বকরী পাল থেকে নেকড়ে একটি বকরী নিয়ে গিয়েছে। আমি তো অন্যান্য আদাম সন্তানের মতো একজন মানুষ। তাদের মতো আমিও মনঃক্ষুণড়ব হই। এ দৃশ্যে রাগ সংবরণ করতে না পেরে তাকে চপেটাঘাত করে ফেললাম। এরপর আমি রসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে আসলাম (এবং সব কথা বললাম)। কেননা বিষয়টি আমার কাছে খুবই গুরুতর মনে হলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে আল্লাহর রসূল ﷺ! আমি কি তাকে (দাসী) মুক্ত করে দিব? তিনি বললেন : তাকে আমার কাছে নিয়ে আসো। সুতরাং আমি তাকে এনে রসূলুল্লাহ এর কাছে হাজির করলাম। আল্লাহর রাসূল তার একটি ছোট্ট পরীক্ষা নিলেন। ঈমান বিষয়ক প্রশ্ন। আল্লাহ তা'আলা কোথায়? এমন ডাগর ডাগর চাহনী কিশোরীটি সাত পাঁচ না ভেবে সোজা সাপটা উত্তর দিলো, আল্লাহ তা'আলা আসমানে! এরপর নবীজির প্রতি তার বিশ্বাস কেমন, সেটা জানার জন্য একটি প্রশ্ন করলেন- আমি কে? এবারও তার উত্তর সঠিক ছিলো– আপনি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল'**। (সহীহ মুসলিম, হাদিস নং-৫৩৭) তখন তার মনিবকে বললেন, তাকে আযাদ করে দিতে পারো। সে তো পাক্কা মু'মিন। তখন সে মুক্ত হয়ে খোলা জীবন যাপন করা শুরু করল।

এ ঘটনায় ছোট্ট কিশোরীর মুখে কী জানলে? আল্লাহ কোথায়? উত্তরটা সহজ না? অনেক আগেই তোমাদের মতো শিশুদের মুখে মুখে ছিলো– আল্লাহ আরশে সমুন্নত। সুন্দর না?

– জ্বি।

–কুরআনেও এর সরল কিছু আয়াত আছে, সেখানেও বলা আছে– তিনি আসমানে। (এই টেকনিক্যাল যুগে বড় বড় প্রযুক্তির কল্যাণে মানুষ যেখানে এক জায়গায় বসেই পুরো দুনিয়া নিয়ন্ত্রণ করছে, গোপন ক্যামেরা আর অত্যাধুনিক সব প্রযুক্তি ব্যবহার করে) সেখানে আল্লাহ তা'আলা আসমানে থেকে আমাদের সাথে থাকা অস্বাভাবিক কিছুনা। তাঁর জ্ঞান ও নজরদ ারির মাধ্যমে পুরো পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। একেবারে সহজ কথাগুলোই কুরআানের দুটি আয়াতে স্পষ্ট হয়– আল্লাহ তা'আলা বলেন– **'তোমরা কি নিরাপত্তা অনুভব করো, যিনি আসমানে আছেন তাঁর থেকে?'** (সূরা মূলক, আয়াত নং- ১৬) আবার সূরা হাদীদে বলছেন– **'তিনি তোমাদের সাথেই আছেন, তোমরা যেখানেই থাকো'**। (সুরাতুল হাদীদ, আয়াত নং- ০৪)

মানে, তিনি আসমানে থেকেও আমাদের সব কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রাখেন। দেখেন, শুনেন, একেবারে অন্ধকার রাতে পিঁপিঁলিকার হাঁটাচলা, মানুষের প্রতিটি শব্দ-ও তাঁর জানার

বাইরে নয়।

– অনেক কিছু জানলাম। আলহামদু লিল্লাহ!

- আরও দুটি কথা বলি, আল্লাহ সবখানে আছেন, অনেকের তাই বিশ্বাস। এটা ভ্রান্ত ও অমূলক। এক্ষেত্রে আমরা হাদীস ও কুরআনের দলীলকে গ্রহণ করবো।

দ্বিতীয় কথা, **তাঁকে তাঁর সৃষ্টির অবয়বে মিলানো যাবেনা**। তিনি তাঁর মতই অনন্য ও অদ্বিতীয় সত্তা। এই আসমান যমীন কত বিশাল! তাহলে চিন্তা করো, তিনি কত মহান ও বিশাল হতে পারেন! তাঁর হাতেই পাহাড়পর্বতের, সমুদ্রের তলদেশের নড়াচড়া, উত্থানপতন। যমীনের সুপীয় পানিও চাইলেই মাটির গহবরে তিনি নিয়ে যেতে পারেন। পৃথিবীর সবকিছু তাঁর ইশারায় চলে। আসমান– যার উপরে তিনি অবস্থান করেন, সেটাও তাঁর সৃষ্টি- তবে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো- তাঁর উপর আল্লাহর অস্তিত্ব টিকে থাকেনা। আসমানের থাকা না থাকাতে তাঁর কোন যায় আসেনা। তিনি সবকিছুর ঊর্ধ্বে।

আল্লাহ কেমন করে আমাদের দেখেন, অথচ আমরা তাঁকে দেখিনা?

সব জীবজন্তুর, বিশেষ করে মানুষের দৃষ্টিক্ষমতা ও তার অনুভূতি ক্ষমতা খুবই কম। মানুষ দুনিয়াতে অনেক কিছুই স্বচক্ষে দেখার ক্ষমতা রাখে না। তাই তো দেখা যায় মানুষ ম্যাগনিফায়িং গ্লাস বা এজাতীয় অনুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করে ছোট থেকে ছোট বস্তুকে দেখার জন্যে। তাহলে ভাবার বিষয়, যেখানে আল্লাহর ঐ সামান্য সৃষ্টিকেই দেখতে এত আয়োজন, এত কসরত, কখনও দেখতে পাই কখনও পাইনা, সেখানে মহান প্রতিপালকে অবলোকন করা কি চাট্টিখানি কথা ? দুনিয়াতে আল্লাহকে কোন উপায়েই দেখা সম্ভব না। তাঁকে না দেখেও বিশ্বাস করি তাঁর অস্তিত্বকে; আমাদের প্রতি তার দয়া মায়া ও ভালোবাসার কথা ভেবে।

এখন যে আমি তোমার সাথে কথা বলছি তাঁর দর্শন নিয়ে, তাঁকে স্বচক্ষে দেখার আকাঙ্খা নিয়ে- সবই তিনি শুনছেন। তিনি যে সব কিছুর ক্ষমতা রাখেন। এক মুহূর্তেই সব খবর পেয়ে যান। আমাদের থেকে কত্তগুণে বড়, তা কল্পনা করা যায়না। এজন্যই তিনি আমাদের দেখেন, কিন্তু তাঁকে কেউ দেখেনা। এমনকি নবী রাসূলগণও দেখেননি।

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলছেন,**'তাঁকে কোন চক্ষু অবলোকন করতে পারেনা, কিন্তু তিনি**

সকল দৃষ্টিকে দেখেন। তিনি পরম দয়ালু, মহাবিজ্ঞ’। (সূরা আনআম, আয়াত নং- ১০৩)

অনেকটা বিল্ডিংয়ের ছাদে ওঠা ব্যক্তির মতো। তিনি রাস্তায় থাকা সবকিছু এক পলকে এক জায়গায় দাড়িয়ে দেখবেন, কিন্তু সবাই তাঁকে দেখবেনা। তাই না?

–হ্যাঁ

– আবার আমরা পৃথিবীর বহু অস্তিত্বশীল জিনিস দেখিনা, কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি। যেমন, প্রাণ। আবার যদি অনুধাবন করতেও পারি, তো বাস্তবে স্বচক্ষে দেখিনা। যেমন আমাদের কথাবার্তার আওয়াজ, পাখিদের কিচিরমিচির শব্দ, হাওয়া বাতাস ইত্যাদি।

- তাহলে পরকালেও কি দেখা যাবেনা তাঁকে?

– হ্যাঁ, পরকালে দেখতে পাবো। আমাদের রাসূল ﷺ ও বলে গেছেন তাঁকে দেখার কথা। তখন আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা তাঁর দিদারে ধন্য হবো। তখনকার চোখ হবে পার্থিবজগতের চোখের চেয়ে আলাদা।

কীভাবে আল্লাহ এক সাথে এত্ত মানুষকে দেখতে পান?

প্রায়োগিক উত্তর দেবার জন্য প্রয়োজনে একটা পর্যবেক্ষণ করা যায়। আমরা তাকে বলবো:

- চলো আজ রাস্তার ধারে হাঁটি, সাথে তোমার একটি কাজ। যত মানুষ দেখবে একটা একটা করে গুণবে। গুণা শেষ হলে বলবে, কজন দেখতে পেলে। ঠিক আছে?

এরপর আমরা যাবো বাসার দ্বিতীয় তলায়, সেখান থেকে রাস্তামুখে যত মানুষ দেখবে, সব এক এক করে গুণে শেষ করবে। সর্বশেষ গন্তব্য হলো বাসার ছাদ। সেখানেই আমাকে বলবে কজন মানুষ বেশী গুণতে পারলে। ঠিক তো?

- আচ্ছা ঠিক আছে।

- এবার দেখো তো, এই দূরবীণ দিয়ে কেমন দেখো? হ্যাঁ, এখন আরও ভাল দেখছো, একটা একটা ধরে ধরে গুণতে পারছো, কোন সমস্যা হচ্ছেনা। এতো গেল মানুষের ক্ষেত্রে, একবারে কাছে থেকে একটু কম দেখি, আরেকটু উপর থেকে ভালো দেখি, একবারে ছাদে দূরবীণ দিয়ে দেখলে রাস্তার সব আমরা একহাতে গুণতে পারি- তাহলে যিনি সবকিছুর ঊর্ধ্বে, সকল ক্ষমতার উৎস যিনি, আমাদেরকে ও পৃথিবীর সব যিনি সৃষ্টি করলেন, তিনি তো উপর থেকে একসাথে সবাইকে পর্যবেক্ষণ করবেন- তা আমরা সংখ্যায় যতই হই- সমস্যা হওয়ার তো কথা না।

আর আমরা জানি, তিনি কোন কিছুর সাথে সাদৃশ্য রাখেন না। সবকিছুর ঊর্ধ্বে তার ক্ষমতাবল। তাহলে যেটা তার জন্যে স্বাভাবিক, তা নিয়ে প্রশ্ন করাই বোকামী। **'আল্লাহ সর্ব বিষয়ের উপরই ক্ষমতাবান'**। (সূরা বাকারাহ, আয়াত নং- ১০৬)

–আচ্ছা, একটি ছোট্ট প্রশ্ন, পিঁপড়া যখন দলবল নিয়ে হেঁটে যায়, তখন আমরা তাদের পুরোদলগোষ্ঠী একসাথে দেখি, তাইনা।

- হ্যাঁ, আলহামদু লিল্লাহ।

– কিন্তু চিন্তার বিষয় হলো, তারা কি তোমার পুরা শরীর একসাথে দেখতে পায়? সোজা উত্তর: না। পুরো শরীর দেখবে তো দূর কি বাত, একটি আঙ্গুলের এক কোনাও চোখে পড়ার মতো না। তার কাছে একটি আঙ্গুল পাহাড় সমান মনে হয়। তাইনা?

– হ্যাঁ।

–সুন্দর, তার মানে সে একপলকে আমাদেরকে পুরোপুরি দেখার ক্ষমতা রাখেনা, অথচ আমরা রাখি। এটাই স্বভাবজাত ও প্রাকৃতিক।

এখন পিঁপড়া দল যদি তোমাকে বলে, আপনারা আমাদেরকে একসাথে কিভাবে দেখতে পান, আমরা কেন পারিনা, আমরা তো সংখ্যায় কম নই– এমন অবুঝ ও বেসামাল প্রশ্ন যদি করে বসে, তাহলে কি উত্তর হবে বলো তো।

- এটা তো একেবারে স্বাভাবিক। তারা ছোটপ্রকৃতির, আমরা অবয়বে কতবড়। তাদের দেখার শোনার শক্তি পরিমাণই দেখতে ও শুনতে পাবে।

- হ্যাঁ, খেয়াল করলেই বুঝবে, একটা পিঁপড়া অঞ্চলে গেলেই দেখা যায়, তাদের ঝোপঝুপড়িতে কত শত পিঁপড়া কিলবিল করে। একটুকরো মাটি বা পাথরে শত শত তাদের ঘরদোর, এক নিমেষেই কিন্তু আমরা তাদের দেখে ফেলি। এটা আমাদের প্রাকৃতিক শক্তিবলেই পারি; তারা পারেনা। কারণ, ঐটুকুই তাদের দেখার শক্তি অতটুকই।

তাই আল্লাহর দর্শন ও আমাদের দর্শন সম্পূর্ণ আলাদা। ঐ পিঁপিলিকা দলের মতোই নিরীহ ও অসহায় জীব আমরা। **তিনি কিভাবে এত্ত মানুষ একসাথে দেখেন আমরা কেন, পারিনা-** এমনধরনের প্রশ্ন মূলত ঐ পিঁপড়ার থেকে আলাদা কিছু না। **'আল্লাহ সর্ব বিষয়ের উপরই ক্ষমতাবান'**। (সূরা বাকারাহ, আয়াত নং- ১০৬)

তিনি কি রাতের কুটকুটে অন্ধকারেও দেখেন?

এজাতীয় প্রশ্নে বাবা মা, মুরুব্বিরা আধুনিক জিওগ্রাফিক্যাল বনজঙ্গলের ভিডিও দৃশ্যের সাহায্য নিতে পারেন। এতে শিশুরা খুব দ্রুত শিখে ও হৃদয়ঙ্গম করে। অন্ধকার প্রতিবন্ধক হয় না গুহাবাসী-জীবজন্তুকে ধারণ করতে- এরকম ভিডিও ও দৃশ্য ইন্টারনেট ও মিডিয়াগুলোতে দেখা যায়। আবার অন্ধকার রাতে অতন্দ্রপ্রহরী ও সৈন্যরা বিশেষ যন্ত্র ও টেলিস্কোপ ব্যাবহার করে অন্ধকারেও দেখছেন- এমন দশ্যের ভিডিও-ও চোখে পড়ে।

আরও আশ্চর্যের বিষয় হলো, প্রযুক্তির উৎকর্ষে এমন কিছু আলোকচিত্রগ্রাহী যন্ত্র ও লেজার বের হয়েছে, যার সাহায্যে দূরতম জিনিস, এমনকি সমুদ্রের তলদেশের ছোট ছোট মাছও দেখা যায়। মানে অন্ধকার, আবার বস্তুর ভিতর দিয়েও দেখার যন্ত্র মানুষ আল্লাহর ইশারায় বের করেছে।

- তাহলে বুঝার বিষয়, যদি মানুষের মতো এতটা ছোট; তবে বুদ্ধিমান প্রাণীর এমন জিনিস আবিষ্কারের সুযোগ হয়, যেটা দ্বারা বস্তু ভেদ করে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত দেখা যায়– তাহলে সেই মহান সত্তার ব্যাপারে কেমন ধারণা করা যায়, তিনি কতটা শক্তিধর ও ক্ষমতার অধিকারী, যিনি এই নিরীহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন?

কত আশ্চর্যের বিষয়! তাই না?

হ্যাঁ, এই বুদ্ধিমান মানুষ; যে কিনা আল্লাহ প্রদত্ত যৎসামান্য শক্তিবলে এত এত আবিস্কার করে ফেলে, তাহলে যেই সত্তা আদ্যোপান্ত সবকিছুর মালিক ও খালিক পালনকর্তা- তাঁর কাছে কী এটা অস্বাভাবিক, রাতের অন্ধকারে দেখা? নাহ্!

তিনি যা চান তা থেকে কোন কিছুই তাঁকে রদ করতে পারেনা।

এখানে তাকে মূল বার্তাটুকু ধরিয়ে দিতে হবে যে, তিনি মানুষ সদৃশ্য নন, কোন দালানকোঠার দেয়াল তাঁর চক্ষুকে আড়াল করতে পারেনা। তিনিই তো সব কল্যানের আধার ও শক্তিধর। সবসময় তাঁকে স্মরণে রাখা চাই; চলনে, বলনে, ওঠাতে, বসাতে-সর্বাবস্থায় তাঁকে ধ্যানে রাখা আমাদের করণীয়।

? আমরা যখন বাসাবাড়িতে দরজাজনালা বন্ধ রাখি, তখনও কি তিনি পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা রাখেন?

– আচ্ছা, এই প্রযুক্তি উৎকর্ষে উদ্ভাবিত বহু যন্ত্রের মাঝে ডাক্তাররা এক্সে ও আল্টাসানো মেশিন দ্বারা মানুষের ভিতরে হাড়হাড্ডি ও পেটের বাচ্চার অবস্থা জানতে পারে। তা কি তোমরা জানো?

– সুবহান আল্লাহ! সত্যি তাই! বিশাল ব্যাপার তো ..

– এ তো স্রষ্টার অভাবিত ও অকল্পনীয় সৃষ্টি! তাই না?

– বিলকুল তাই..

এই মাংসে ঢাকা হাড়হাড্ডি যদি মানুষ দেখতে পাই - তাহলে যিনি মানুষকে সৃষ্টি করলেন তাঁর কথা চিন্তা করো তো। তাঁর জন্যে এগুলো কি কোন জটিল বিষয়?

– কখনও না।

তিনি পথে ঘাটে হাটবাজারে এমনকি নির্জন অন্ধকার রুমেও তোমাকে আমাকে পর্যবেক্ষণ করছেন। পরিষ্কার তো এখন?

– আলহামদু লিল্লাহ।

? এটা কিভাবে সম্ভব? এত মানুষের কাজকর্ম হিসাব রাখা, তাও একাই?

একটি বিষয় তোমাদের মাথায় গেঁথে নিতে হবে। সব সুন্দর ও পূর্ণাঙ্গ গুণাবলী কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য। তাঁর ক্ষমতা অসীম। কুরআন বহু জায়গায় তাঁর কুদরতের বিষয়টি এভাবে জানিয়েছে- **'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান'**। (সুরা আল-বাকারাহ-১০৬) আচ্ছা, একটা উদাহরণ দেয়া যাক। তোমরা ক্যামেরা দেখেছো, ছবি উঠানোর ক্যামেরা?

– হ্যাঁ, আলহামদু লিল্লাহ..

ছোট বড় হরেক রকমের ক্যামেরা আছে। কিন্তু এর লেন্স কত বড় বড় ডাটা ও দৃশ্য ধারণের ক্ষমতা রাখে, তা তোমরা জানো না হয়তো। ভাবলেই মুখে সুবহানাল্লাহ উচ্চারিত হয়।

– তাই?। সুবহান আল্লাহ!

মানুষ সীমাবদ্ধ প্রাণী, তার উদ্ভাবনশক্তি আরও সীমিত, তার তৈরী ক্যামেরা ও লেন্স আরও ক্ষীণ ও দুর্বল। কিন্তু যিনি মানুষ ও তার সৃষ্টির মালিক তিনি কিন্তু মহা শক্তিধর। তাঁর উদাহরণ আরও অনন্য। কী দিয়ে যে বোঝাই তার জ্ঞান প্রজ্ঞা ও কুদরত-শক্তির কথা! ভাষায় প্রকাশ করা যায়না। এতো বিশাল ক্ষমতা যেই সত্তার আসমান-যমিনের কোন কিছু কি তাঁকে অপারগ করতে পারে?

– অসম্ভব..

এবার আরো একটা উদাহরণের পালা। ধরো, তুমি একটা কোম্পানির মালিক, বিশাল বড় কোম্পানি। তুমি চাচ্ছো, কাজের সুবিধার্থে সকল কর্মচারীকে একসাথে পর্যবেক্ষন করতে, তাদের তদারকি করতে, যাতে কাজে ফাঁকি দেয়ার কোন অজুহাত তারা না খুঁজে পায়। দোকান থেকে সিসি ক্যামেরা কিনলে, প্রত্যেকটা সেক্টরের জন্যে আলাদা আলাদা। সব তোমার অফিসরুম থেকে নিয়ন্ত্রণ হবে। জায়গাবিশেষ স্কাই কামেরা লাগালে, মানে গোপন ক্যামেরা। সব তোমার নখদর্পণে থাকবে, তাদের চুলচেরা খবরাখবর রাখতে পারবে, অথচ তারা জানবেই না। একটি মনিটরেই সকল ক্যামেরার স্ক্রিন। এভাবে এক জায়গায় বসেই সব সেক্টরের খবর তুমি একহাতে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছ। কত দারুণ, তাইনা?

– সুবহান আল্লাহ! সত্যিই অসাধারণ তো ..

আল্লাহর দুর্বল অসহায় সৃষ্টি মানুষ যদি এতকিছু করতে পারে, তাহলে অসীম ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহর জন্য সবাইকে একসাথে পর্যবেক্ষণ করা কি অসম্ভব হতে পারে?

– আদৌও না..

? কেন মানুষ মরে অথচ আল্লাহর কোন মৃত্যু নেই?

মনে রাখতে হবে, মৃত্যু অবধারিত তাকদির হলেও এটিই সবকিছুর শেষ নয়; বরং এর দ্বারা মানুষের ইহজগতের ইতি এবং পরলোকের সূচনা ঘটে। সেটাই কিন্তু মুখ্য ও অগ্রগণ্য জীবন, বিশেষত মু'মিনদের জন্যে। চলো না, আল্লাহর ভাষায় শুনে আসি- **‘প্রতিটি প্রাণ মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে; অতঃপর তোমরা আমারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে’**। (সুরা আল-আনকাবুত, আয়াত নং- ৫৭)

মৃত্যু মানুষের জন্যে একটি অবধারিত উপসর্গ ও দুর্বলতার প্রমাণ। প্রতিটি সৃষ্টির জীবন আছে, আবার মৃত্যুও আছে। জীবন জগতের অলঙ্ঘনীয় চিরচেনা বিধান, জন্মিলে মরিতে হয়।

– এবার তোমরা শুধাতে পারো, সবার যখন মৃত্যু হবে, তখন আল্লাহর কি মরণ হবে না?

– তাহলে শুনো, আমরা মানুষ। মানুষ সৃষ্টিজীব। তাই তার মৃত্যুও অবধারিত। কিন্তু আল্লাহ স্রষ্টা। তাঁকে কেউ সৃষ্টি করেনি। তাই তিনি মৃত্যুবরণ করবেন না। মৃত্যুর দুর্বলতা থেকে তিনি চিরমুক্ত। আমরা মানুষ জন্মেছি, কিছুদিন বাঁচবো, আবার মারা যাবো, মৃত্যুর মাধ্যমেই এ জীবনের পরিসমাপ্তি হবে। অপরদিকে স্রষ্টা, আল্লাহ্ তা'আলা চিরঞ্জীব ও অমরণশীল, তাঁর

জীবন আমাদের মতো না। তাই তো মৃত্যুবরণ করাও তাঁর শানে যায় না। কেননা, তাঁর অন্যতম গুণাবলী হলো জীবন্ত ও চিরঞ্জীব। এই নামের বাস্তবতা টিকে থাকবে তখনিই যখন মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ না করবে। অর্থাৎ তাঁর সকল পরিপূর্ণ গুণাবলীর দাবী হলো জীবিত থাকা। এখন পরিষ্কার তো?

– আলহামদু লিল্লাহ..

আল্লাহ কি আমাদের ভালোবাসেন, আমরা যেমন তাঁকে ভালোবেসে থাকি?

আমরা জানি, আল্লাহ তা'আলা পরম ক্ষমাশীল অতি দয়ালু। তিনি ভালোবাসেন পবিত্র ব্যক্তিদের, মুস্তাকিমের পথে অটল বান্দাদের আর সত্যবাদীদের। তাঁর মুখ থেকেই শোনা যাক- **'শীঘ্রই আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় আনবেন যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং যারা তাঁকে ভালোবাসবে'**। (সূরা আল-মায়িদাহ্, আয়াত নং- ৫৪)

– 'আমরা আল্লাহকে ভালোবাসি' এ বাণী মুখে জপলেই কি হবে? প্রমাণ দেয়া লাগবে। কী বল তোমরা?

– অবশ্যই..

তাঁর ভালোবাসার প্রমাণ কিভাবে দিবো, সে প্রসঙ্গে আসি। শোনো তাহলে, আল্লাহর ভালোবাসার দাবি তখনিই টিকবে, যখন তাঁর আদেশ পালন করবো ঠিকঠাক মতো। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবো, বাবা মায়ের প্রতি সদাচারণ করবো, দান সাদাকা করবো, পরোপকার করবো এবং কুরআন তিলাওয়াত ও যিকির আযকার সব ঠিকঠাক করবো। তাঁর নির্দেশিত সব ভালো কাজ করা এবং নিষিদ্ধ কর্মগুলো হতে বিরত থাকলেই আমরা তাঁর ভালোবাসার দাবি করতে পারবো।

– তিনি যে আমাদের ভালোবসেন তার প্রমাণ কী?

– সবচে বড় প্রমাণ তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। ভালো না বাসলে পয়দা করতেন কি? কখনও না। একটু চোখ-কান খোলা রাখলেই তাঁর নিয়ামতরাজি ও ভালোবাসার কথা অন্তর দিয়ে অনুভব করবো। কত বড় যে দাতা তিনি, তাঁর বলার অপেক্ষা রাখেনা। তাঁর ভালোবাসার ও নিয়ামত প্রদানের কোন গণনা হয়না। তিনি আমাদের সম্মানিত করে সৃষ্টি করেছেন। দেখভাল করেন, খাবার-দাবার, পোষাকাদিসহ অন্যান্য প্রয়োজন তিনিই মিটান। আবার বান্দার গুনাহকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন।

তবে শুধু তাঁর ভালোবাসা তাঁকে স্মরণ করলেই, তাঁর কথা মন দিয়ে মানলেই পাওয়া যাবে, অন্যথায় নয়। পরিষ্কার তো?

– জ্বি, আলহামদু লিল্লাহ।

ফিরিশতাদের
সম্পর্কে শিশুর প্রশ্ন

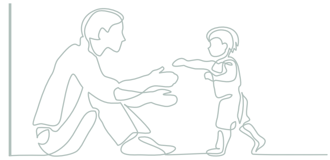

ফিরিশতা কারা? তাদের আকার-আকৃতি কেমন?

তোমরা শুধাতে পারো ফিরিস্তারা কেমন? চলো জানা যাক তাদের সম্পর্কে মজার কিছু তথ্য..

– মানুষ যেমন সৃষ্টি, ফিরিশতারাও ঐ এক আল্লাহরই সৃষ্টি। পার্থক্য হলো, তারা নূরের তৈরী, তাদের সৃষ্টি মানুষের আগে হয়েছে। তারা স্বভাবে, জ্ঞানেগুণে মানুষের থেকে আলাদা। সৃষ্টিগতভাবে তাদের চেহারা অনিন্দ্যসুন্দর। এমনকি তাদের ডানা পর্যন্ত আছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের মানুষের আকৃতি ধারণ করার ক্ষমতা দিয়েছেন। তবে তারা আহারবিহার করেননা।

– সুবহান আল্লাহ! সত্যিই তারা এরকম..

– এবার আরও কিছু বিষয় জানা যাক.. তারা কেবলমাত্র আল্লাহর ইবাদতগুজার বান্দা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ইশারায় চলে। একটু নড়চড় হয়না। ফিরিশতারা মর্যাদাগত দিক দিয়ে একেকজন একেক অবস্থানে আছেন। তাদের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাশীল ফিরিশতা হলেন জিবরাঈল عليه السلام। তিনি নবী-রাসূলগণের নিকট ওয়াহি বা রবের প্রত্যাদেশ নিয়ে আগমন করতেন। আরও তিনজন সম্মানিত ফিরিশতা হলেন, মিকাইল عليه السلام, ইসরাফিল عليه السلام এবং আজরাইল عليه السلام বা মালাকুল মাউত। প্রত্যেকেই স্ব স্ব কাজে নিয়োজিত।

আবার একদল ফিরিশতা আছেন বান্দাদের সাহায্য- সহযোগিতা ও হিফাযতের কাজে নিয়োজিত। তাদের বলা হয়, সংরক্ষনণকারী ফিরিশতা। তারা প্রতিটা মুহূর্তে বান্দাদের দেখাশুনা ও তদারকি করে থাকেন। ভালো-মন্দ সবকিছুর বিচার-বিশ্লেষণ করে লিপিবদ্ধ করেন। এছাড়াও আরও অনেক ফিরিশতা আছেন। অগণিত ও অসংখ্য। প্রত্যেকেই আপন আপন দায়-দায়িত্বে দিনভর ব্যস্ত -মশগুল।

ফিরিশতাদের নাম কী?

তোমরা আগেই জেনেছ, ফিরিশতারা অসংখ্য ও অগণিত। তাদের সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই বলতে পারেন। তাদের উল্লেখযোগ্য কয়েক জনের নামও আমরা জেনেছি, কুরআন-সুন্নাহতে যা উদ্ধৃত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য ফিরিশতারা হলেন: জিবরাঈল, মিকাঈল, ইসরাফিল,

রিযওয়ান, মালিক ﷺ। এছাড়াও আছেন অনির্দিষ্ট ও নামহীন আরশবাহী ফিরিশতা। আর সবশেষে হাফাযাহ্ তথা মানুষের কাজকর্ম ও আমলের হিসাবে নিয়োজিত ফিরিশতাকুল। এর বাইরে আমরা অন্য কোন ফিরিশতারা নাম জানতে পারি না। তোমাদের নিকট বিষয়টি পরিষ্কার হয়েছে তো?

– জ্বি, আলহামদু লিল্লাহ।

কেন আল্লাহ তাদের সৃষ্টি করলেন?

খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। তবে তোমরা আগেই জেনেছ, প্রতিটি সৃষ্টির পিছনে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার মহা উদ্দেশ্য। তাঁর কোন সৃষ্টিই উদ্দেশ্যহীন নয়। আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাকুল সৃষ্টি করলেন শুধুমাত্র কল্যাণের জন্যে। তারা হলেন কল্যাণকর পূণ্যবান জাতি। পাপ কাজে জাড়ানো তো দূরের কথা, অপরাধ ও পাপ কী জিনিস সেটা জানেই না।

তারা মূলত আসমানবাসী। তবে ক্ষেত্রভেদে তারা মানুষের কাছে আসেন, যেগুলো তাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। যেমন: বান্দাদের আমলনামার হিসাবনিকাশ, তাদের দেখভাল ও হেফাযত করা, নবী-রাসূলদের কাছে ওয়াহী নিয়ে আসা, যুদ্ধের ময়দানে সাহায্য যোগানো, তালিবুল ইলমদের ও সর্বোপরি যিকিরের মজলিসগুলোতে এসে হাজির হওয়া ইত্যকার গুরুদায়িত্বে নিয়োজিতরা দুনিয়াতে নেমে আসেন ও ফিরে যান।

আরও সহজ বাংলায় বললে, তাদের দুটি মহাগুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব; **(এক)** ইবাদত উপাসনা, **(দুই)** সারাজাহানের জায়গাবিশেষ কাজ আঞ্জাম দেয়া। ব্যস, এজন্যেই তাদের সৃষ্টি করা।

কেন ফিরিশতাদের আমরা দেখতে পাইনা?

মানুষের পক্ষে ফিরিশতার আসল আকার-আকৃতি দেখা সম্ভব না। এটা মানুষের সীমাবদ্ধতা। কিন্তু কখনও যদি মানুষ-সাক্ষাতের প্রয়োজন হয়-ই, তাহলে তাদের রূপ ও অবয়ব পরিবর্তন করা লাগে। তারা মানুষের আকৃতি ধারণ করেন। ফলে একে অপরের বোঝাপড়া ও সাক্ষাত সম্ভব হয়। এরকম একটি উদাহরণ আমরা হাদিসে পাই; যেখানে জিবরাঈল ﷺ এক আরব বেদুইনের আকৃতিতে রাসূলের কাছে এসে সাহাবীদেরকে দ্বীন ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো শিক্ষাদান করেন।

জ্বিন কারা?

জ্বিন জাতি, তারাও আল্লাহর সৃষ্টিগুলোর একটি। তবে তাদের সৃষ্টি- উপাদান হলো: আগুন। তারাও মানবজাতির মতো সবরকম পুণ্যকাজে আদিষ্ট, সবরকম অপকর্মে থেকে নিষেধপ্রাপ্ত। অন্যসব সৃষ্টির মতো এদেরও বিনাশ হবে। আমরা মানুষ্যজাতি তাদেরকে দেখিনা, সে ক্ষমতা আমাদের নেই।

আবার তাদের সৃষ্টি অবয়বে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলো মানুষের মাঝে নেই। যেমন উড্ডয়ন করা ও ভিন্ন আকৃতি ধারণ করার ক্ষমতা। চাইলেই যখন তখন এক রাজ্য ছেড়ে ভিন্ন রাজে উড়ে যায়। এক মুহূর্তেই। মানে পৃথিবীতে মানুষের মতো তারাও সৎকর্মের আদেশ ও অসৎকর্ম থেকে বিরত থাকার নির্দেশ পেয়েছে ঠিকই, তবে উভয়ের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও সৃষ্টি উপাদানে পার্থক্য আছে। তারা আগুন দ্বারা সৃষ্টি আমরা মাটির সৃষ্টি।

? কে বড় ক্ষমতাশীল; জ্বিন না ফিরিশতা?

সুন্দর একটি প্রশ্ন, উত্তরটাও মজার। ফিরিশতারাও আল্লাহর সৃষ্টি আবার জ্বিনও আল্লাহর সৃষ্টি। তবে উভয়ের মাঝে পার্থক্য হলো, মানুষ ও জ্বিনের মতো ফিরিশতাদেরও জন্মলাভের সময় আছে কিন্তু তারা মৃত্যুবরণ করবে শিঙ্গায় ফুৎকার দিলে। অন্যদিকে জ্বিন জাতির মানুষের মতো স্বাভাবিক জন্মমৃত্যু হয়ে থাকে।

আবার সর্বাধিক ক্ষমতাবান ফিরিশতা মালাকুল মাউত জ্বিন জাতির প্রাণ কবজ করে থাকেন। যেমনটি কুরআনে এসেছে, **‘আল্লাহই জীবসমূহের মৃত্যু প্রদান করেন তাদের মৃত্যুর সময়’।** (সুরা আয-যুমার, আয়াত নং- ৪২)

এ থেকে প্রমাণ হয় ফিরিশতা জাতি জ্বিন জাতি থেকে বেশী শক্তিবান। এটা একটি দিক।

অন্যভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, জ্বিনরা ফিরিশতাকে ভয় পায়। এরকম একটি বর্ণনা আমরা স্বয়ং কুরআনেই পাই- গাযওয়ায়ে বাদরের দিন, যখন আল্লাহ তা‘আলা মু’মিনদের সাহায্য করার জন্য ফিরিশতাবাহিনী পাঠালেন শয়তানের (ফুটনোট: শয়তান জ্বিন জাতির অন্তর্ভূক্ত) তখনকার পরাজয় ছিলো সত্যিই মজাদার। **‘তোমাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক রইল না, তোমরা যা দেখতে পাও না আমি তো তা দেখি, নিশ্চয় আমি আল্লাহকে ভয় করি’, আর আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর’**। (সুরা আল-আনফাল, আয়াত নং- ৪৮) এ থেকেও প্রমাণ হয়ে যায়, কারা বেশী শক্তিবান।

? ফিরিশতারা কি মরণশীল?

হ্যাঁ, অবশ্যই। ফিরিশতারাও মরবেন। কারণ তারাও সৃষ্টি। সকল সৃষ্টিই বিনাশী। একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা অবিনাশী, অমর ও চিরঞ্জীব। কুরআনে এসেছে– **‘আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল’**। (সুরা আল-কাসাস, আয়াত নং- ৮৮)

উভমণ্ডল, আসমান-যামীনের সবকিছুই ধ্বংস হবে। তবে ‘ইল্লা মা-শাআল্লাহ’। একমাত্র তিনিই বাকী থাকবেন। তিনি মারা যাবেন না।

আসমানি কিতাব
নিয়ে শিশুদের করা প্রশ্ন

আসমানী কিতাবগুলো কী কী?

আমরা জানি, আসমানি কিতাব বলতে আসমান থেকে নবী রাসূলদের উপর অবতীর্ণ কিতাবগুলোকে বোঝায়। এগুলো আল্লাহ তা'আলা মানব ও জ্বিন জাতির হিদায়াতের জন্য প্রেরণ করেছেন। তাঁর দেয়া সঠিক পথের দিশাবাহী গ্রন্থের নির্দেশনা মতো চললেই তাদের সুখ আর সুখ। ইহকালেও পরকালেও। বুঝতে পেরেছ তো?

– জ্বি, আলহামদু লিল্লাহ। তোমরা উল্লেখযোগ্য চারটি আসমানী কিতাবের নাম শুনেছ নিশ্চয়। বলতে পারবে কোনটি কার উপর অবতীর্ণ হয়েছে? অবশ্যই..

– দাউদ عليه السلام যাবুর পেয়েছেন, মুসা عليه السلام এর উপর তাওরাত নাযিল হয়েছে, ঈসা عليه السلام কে দেয়া হয়েছে ইঞ্জিল আর সর্বশেষ আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর সর্বশ্রেষ্ঠ আল-কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

– খুব ভালো। মা-শা আল্লাহ! এগুলো ছাড়াও কিছু সহীফা ইবরাহীম عليه السلام ও মুসা عليه السلام এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে– সেটিও তোমাদের জানতে হবে।

কেন আমরা কুরআনের উপর নির্ভর করি? কীভাবে এই কিতাবটি অমর ও অলৌকিক হলো?

শুধু চিন্তা করো, মানুষের তৈরী একটি যন্ত্র বা আবিষ্কারের কথা। এটাকে পরিচালনা করতে গিয়ে যদি গাইডবুক তথা ক্যাটালগ লাগে, যাতে সুন্দর ও সঠিকপন্থায় ব্যবহার করা যায়। তাহলে মানুষও তো একটা সৃষ্টি, মানে আল্লাহর সৃষ্টি, তারও তো একটি গাইডবুক চাই, হেদায়াতের কিতাব, সঠিক পথনির্দেশের কিতাব– যেটা তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি ও বিজয়-সাফল্য এনে দিবে? তাইনা?

– যুক্তিতো এটিই বলে..

এবার আসো কুরআনের অলৌকিকতা ও মু'জিযার বিষয়ে..

সহজ কথা হলো, আমরা সবাই জানি আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ এর পর আর কোন রাসূলের আগমন ঘটবে না। তিনি সর্বশেষ নাবী। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই সকল মানুষদের গাইডবুক কোনটি হবে? সর্বশেষটিই। তাহলে অলৌকিকতা ও ঐশী-ক্ষমতার ভার এই কিতাবের উপর। এর বিকল্প কেউ দাঁড় করাতে পারবেনা। কিয়ামত পর্যন্ত এটাকে কেউ চ্যালেঞ্জ করার সাহস যাতে না পায়, সর্বোপরি যেন কোন প্রকার ঠুনকো অজুহাত দাঁড় করাতে না পারে- এই ব্যবস্থা করা হয়েছে এই কুরআনের মাধ্যমে।

অনেকভাবে এই কুরআনের অলৌকিকতা ও মুজিজা প্রকাশ পায়। সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো, ভাষাগত যাদুময়তা ও ব্যবহারিক শব্দচয়ন। তৎকালীন সময়ের কথা চিন্তা করি। আল্লাহ তা'আলা কুরআন অবতীর্ণ করে আরবের বিদগ্ধ কবি সাহিত্যিক ও ভাষাবিদদের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন এই বলে– দেখাও দেখি এর মতো কোন কুরআন তৈরী করে। একটি সূরা অথবা একটিমাত্র আয়াত! বাঘাবাঘা সব স্পষ্টভাষী সাহিত্যিক ও কবিরা যেখানে হার মানে, সেখানে আর কে আছে তার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার। এখানেই কুরআনের সত্যতা ও একক অনন্য হওয়ার প্রমাণ পাই আমরা।

? কেন আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী কিতবাগুলোকে সংরক্ষণ করলেন না?

এটা সবার মাথায় বদ্ধমূল করে নিতে হবে যে, সব আল্লাহর ইচ্ছার অধীন। তিনি যা ভালো মনে করেন, তাই করেন। কোন সিদ্ধান্তের হিকমাত ও নিগূঢ় রহস্য আমরা জানি, তো কোনটার জানিনা।

এটিও সেই রকমই একটি ব্যাপার। তিনি চেয়েছেন, আমি কুরআন রেখে বাকি সব মানসুখ করে দিবো। তাই করেছেন। তবে আমাদের কাছে বহু দলিল-প্রমাণের আলোকে যেটা স্পষ্ট হয়, সেটা হলো পূর্ববর্তী কিতাব অলৌকিক ছিলোনা। তাছাড়াও প্রত্যেকটি কিতাব ছিলো নির্দিষ্ট জাতিকে কেন্দ্র করে। সে জাতি শেষে তার সঠিক পথের দিশাবাহী ঐশী গ্রন্থের পরিসমাপ্তি হয়েছে। মানে ঐসব কিতাবের প্রয়োজন শেষ, তাই অমর ও মুজিজা খেতাব লাভ করেনি।

? কুরানের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি, তার প্রমাণ দাও?

আসলে এজাতীয় প্রশ্নগুলো একেবারে ছোট্ট মাথায় আসেনা, মাধ্যমিক স্তরের বাচ্চাদের মুখে কদাচিৎ শুনা যেতে পারে যে, আল কুরআনের সত্যতার প্রমাণ কী?

এখানে খুব নিরিহ উত্তর মানাবে না, একটু ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তার সাথে তাকে যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করতে হবে।

প্রথম কথা, আল্লাহর কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ নিজেই নিয়েছেন, যেখানে তিনি বলছেন, **'আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি আর এর সংরক্ষণের দায়িত্বও আমারই'**।

দ্বিতীয়ত, আমরা ঐতিহাসিক অনেক কিছুই অস্বীকার করিনা, বা করতে পারিনা। যেমন নবী রাসূলের আগমন, যুদ্ধবিগ্রহ, সাহাবায়ে কেরাম ইত্যাদি। স্বাভাবিক বিবেক-বুদ্ধিটুকু যার আছে সে মানবেই। এটা দীর্ঘ মেয়াদি বর্ণনা ও নিরবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রমাণিত হয়ে থাকে।

ঠিক একই কথা কুরআনের ক্ষেত্রেও। সেটা মুতাওয়াতির ধারায়- নিরবচ্ছিন্নভাবে সবযুগ পেরিয়ে এসেছে। মুতাওয়াতির ধারা বলতে বোঝায়, বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের এক বিরাট সংখ্যক লোকের বর্ণনা। কেউ সেখানে চুল পরিমাণ সন্দেহ করতে পারে না। সবাই কুরআনের এই ধারাকে দেখে অভ্যস্ত। আর কোন জিনিস বারবার বর্ণনা ও পঠনের মাধ্যমে স্থায়ী ও টেকসই হয়ে যায়। কুরআনের ব্যাপারেও একই কথা।

আর হালাকায়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, সালাতে এত পরিমাণে আমরা মুসলিমরা কুরআন শিখি ও শিখাই যে, সালাতে হোক অথবা অন্য কোন স্থানে দাঁড়িওয়ালা বুজুর্গ ব্যক্তিরও যদি ভুল হয়, তাহলে বড়দের কথা বাদ, ছোট্ট হাফেজ বাচ্চাও সেটাকে ধরে ফেলবে। এভাবেই যুগ যুগ ধরে কোন ভুল-ত্রুটি ও বিকৃতি ছাড়া, অবিকল আমাদের কাছে বর্তমান পর্যন্ত পৌঁছেছে। এতটাই সংরক্ষিত এই কুরআনুল কারীম!

এছাড়াও কুরআনের আগাগোড়া কোথাও কোন ভুল নেই, স্ববিরোধী ও বিপরীত কোন বক্তব্য নেই। এখানে যে মাত্রায় ঐশিবাণী ও বিধান, হুকুম আহকাম ও পূর্ববর্তীদের সংবাদ এসেছে- সেগুলো সন্দেহাতীতভাবে এটাই প্রমাণ করে, এটা মানবীয় দোষেগুণে ভরা লিখিত কোন পুস্তক নয়; বরং অন্যকিছু সেটা।

এটা তো গেল যুক্তি।

এবার বলি চ্যালেঞ্জের কথা। কুরআন একটিমাত্র চ্যালেঞ্জ করেছে দুনিয়ার মানুষদের। সেটা হলো, কুরআনের মতো একটি, মাত্র একটি সূরা, অথবা একটি আয়াত এনে দেখাও দেখি পারো কিনা?! পারলে যে কারোর সহযোগিতা নিতে পারো, জ্বিন হোক অথবা ইনসান।

পারেনি, পারবেও না।

এসবই প্রমাণ করে, কুরআনের মুজিজা ও সত্যতা। বুঝেছো তো?

– জ্বি, আলহামদু লিল্লাহ।

নবী-রাসূলদের ﷺ নিয়ে শিশুমনা প্রশ্ন

নবী রাসূল কারা?

যুগে যুগে মানুষকে সৎপথের দিশা এবং অসৎ পথ থেকে বাধা প্রদানের জন্য হাজারো নবী-রাসূল এসেছেন। নিজের গোত্রের লোকদেরকে আল্লাহর বাণী ও বার্তা পৌঁছে দেয়ার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ। শুধুমাত্র এক আল্লাহর ইবাদতে আহ্বান করবেন। তাদের সংখ্যা অগণিত। তা যে কত, কেউ জানেনা। আল্লাহ জানেন শুধু। ইতিহাসের প্রত্যেক অধ্যায়েই কোন না কোন নবী অথবা রাসূল এসে নিজ জাতিকে সতর্ক করেছেন, সঠিক দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। তাদের সর্বপ্রথম ব্যক্তি হলেন আদম এবং সর্বশেষ আখেরী নবী হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

কেন রাসূলদের পাঠালেন?

ব্যাখ্যাটা এমন, আল্লাহ চাইলেন মানবজাতি তাঁর এবং শুধুই তাঁর ইবাদত করুক। আর শয়তান তো আছেই মানুষকে গোমরাহ করার জন্য । আল্লাহ চান মানুষকে রহমত করতে, হেদায়াতের বাণী শোনাতে। কিন্তু... কিভাবে?

একদল বার্তাবাহক পাঠালেন, যিনি লোকদের কাছে রবের বার্তা পৌঁছে দিবেন অতি যত্নে। মানুষও তাঁর কর্ম সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকবে। সুন্দর আখলাক ও দ্বীন ইসলাম শিক্ষায় যিনি মানুষের জন্য উত্তম নমুনা হবেন, মানুষকে উত্তম কাজ ও গুনাবলী অর্জন করতে উদ্বুদ্ধ করবেন।

এক্ষেত্রে আরও যে গুরুদায়িত্ব এল রাসূল ﷺ এর কাঁধে তা হলো, তাঁর পক্ষ থেকে পাঠানো বাণী ও কিতাব খুলেখুলে বর্ণনা করা। একবারে সহজ ও সাবলীলভাবে। নিজ নিজ ভাষায়। যাতে করে লোকেরা এটুকু বলার সুযোগ না পায় যে, আমাদের কাছে তো মহান রবের বার্তা পৌঁছেনি। আমরা মা'যুর!

ঠিক এজন্য ই তিনি নবী রাসূল ﷺ এর উপরে বড় বড় কিতাব নাযিল করেছেন। তাঁরাও আপন আপন ভাষায় ব্যক্ত করে গেছেন।

আসলেই কি নবীরা ভুলত্রুটির উর্দ্ধে?

মানুষ মাত্রই ভুল করে। আমরা কি ভুল করিনা? নবীরাও মানবজাতি থেকে আলাদা কিছুনা। তবে একটি সূক্ষ্ম বিষয় লক্ষণীয়, সেটি হলো, তাদের মাঝে মানবীয় গুণাগুণ থাকলেও যেহেতু তারা গুরু দায়িত্ব পালন করবেন তথা আসমানী বাণী প্রচার-প্রসার হবে তাদের দ্বারা, তাই

সকল দোষ থেকে না হলেও রিসালাহ ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে তাদেরকে সম্পূর্ণ ক্রটিমুক্ত ও পাপমুক্ত রাখা হয়েছে। আচার-আচরণে তো বটেই, সামান্য কথা ও উচ্চারণেও যাতে বিচ্যুতি না ঘটে; সকলের যেন নমুনা ও আদর্শ হতে পারেন- সেটা আল্লাহ তা'আলা নিশ্চিত করেছেন। অন্যথায় মহান গ্রন্থগুলো নিয়ে লোকেরা খুঁত বের করার চেষ্টা শুরু করে দিবে।

এছাড়া পার্থিব ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের মতো মানুষ ছিলেন। স্বাভাবিক ভুল হয়ে যেত। তবে সেটা আল্লাহর বাণীর মান-মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করতো না। যেমন: ফল ফলানোর উপযুক্ত যায়গা নির্বাচন, যুদ্ধের জন্য জায়গা নির্বাচন অথবা দুনিয়াবি অন্য যে কোন আন্দাজ ও অনুমান হতে পারে।

আচ্ছা, মুহাম্মাদ ﷺ কে?

ঠিক আছে, খুব সংক্ষেপে বলি শোনো। তিনি হলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল: মুহাম্মাদ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁর পুরা নাম হলো, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মোত্তালিব হাশেমি ও কুরাইশী। হস্তি-যুদ্ধের বছর রবিউল আওয়াল মাসের সোমবারে মক্কায় তার জন্ম। মায়ের গর্ভে থাকতেই বাবা মারা যান। মায়ের মৃত্যু যখন হয়, তখন তার বয়স ছয় বছর। এরপর দাদা আব্দুল মোত্তালিব-ই আটবছর পর্যন্ত ভাতিজার দেখভাল করেন। তিনিও ইন্তেকাল করেন শিশু মুহাম্মাদের আট বছর বয়সে। দায়িত্ব আসে চাচা আবু তালেব এর কাঁধে।

লোকেরা তাকে মহানুভবতা ও সত্যবাদিতার জন্য 'সত্যবাদী আল-আমিন' অভিধায় ডাকতো। নবীজি যখন আল্লাহর রাসূর মনোনীত হন, তখন তার বয়স চল্লিশ বছর। আপনভূমি মক্কা-ই ছিলো তার দাওয়াতে ইসলামের প্রথম ক্ষেত্রভূমি। এখানে ছিলেন তেরো বছর। ঘটনাক্রমে অবস্থা যখন খুব সঙ্গিন ও অসহনীয় হলো, তখন হিজরাত করে মদীনাতে চলে এলেন। এখানেই বসতবাড়ি ও ইসলামি রাষ্ট্র কায়েম করলেন। এখানে এসেই আপনভূমি ছেড়ে আসা মুহাজির ভাইদের সাথে মাদীনার আনসারদের সাথে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এভাবেই ইসলামের পতাকা ও আল্লাহর হুকুমত কায়েম করলেন মাদীনার মাটিতে।

আল্লাহর এই মহান বান্দা ও রাসূল যখন অর্পিত দায়িত্ব ও আমানত আদায় করে মৃত্যুবরণ করেন, তখন তার বয়স ছিলো তেষট্টি বছর। হিজরতের এগারোতম বছর।

রাসূল হওয়ার প্রমাণ কী?

রাসূল হওয়ার প্রমাণ? সে তো অনেক ও অগণিত। সবচে বড় প্রমাণ কুরআন নিজেই। যেখানে এই এক কুরআনই যুগযুগান্তরে তার রত্নতুল্য প্রামাণ্য দিয়ে, চ্যালেঞ্জ দিয়ে মানুষকে তাক লাগিয়ে রেখেছে। মানুষ ভেবেই কুল পায়না এর বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য নিয়ে। তাঁর সত্যবাদিতার সম্মোহনী শক্তিতে ও সুন্দর চরিত্রের মাধুর্যে পাগলপারা হিতাকাংখিদের কথা তো পরের ব্যাপার, মক্কার দুশমনেরাই বিমোহিত ছিলো। নইলে কি আর এমনিই 'সত্যবাদি আল-আমিন' উপাধি পান। তৎকালীন সময়ের লোকেদের স্বচক্ষে দেখা বড় বড় মু'জিযা ও অলৌকিক ঘটনার কথাও

তো নবুওয়াতের উল্লেখযোগ্য প্রমাণ বহন করে, যেগুলো বিশুদ্ধ ও বিরাটসংখ্যক বিশ্বস্ত রাবী দ্বারা প্রমাণিত।

মুহাম্মাদ ﷺ এর সুপ্রতিষ্ঠিত শরীয়তের চিরস্থায়িত্ব ও পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবের সত্যায়ন ছাড়াও আরও বড় দুটি প্রমাণ নবুওয়াতের সত্যতাকে সুসংহত করে। **(এক)** রাসূল ﷺ এর পূর্ববর্তী জাতির ঘটনাবলীর বিবরণ ও ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষমতা। **(দুই)** দুনিয়াজুড়ে একমাত্র দ্রুত-প্রসারমান দ্বীন হিসেবে এর পরিচিতি লাভ। আর এ সবই রাসূল ﷺ কে সত্যায়িত করে যে তিনি সত্য নবী।

এক রাত্রে রাসূল ﷺ কিভাবে সপ্তম আসমানে গেলেন?

বোরাকে চড়ে সাত আসমান ভ্রমনের ঘটনা তো বেশ মজার। আল্লাহর রাসূল ﷺ প্রথমে বোরাক নামের বাহনে চড়ে বাইতুল মাকদিস পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে জিবরীল আমিনের সহযাত্রায় তিনি ঊর্দ্ধেগমন করেন। কী আশ্চর্য, তাই না?!

– সুবহান আল্লহ!

আল্লাহ চাইলেই সব করতে পারেন। আসমান যমীনের কেউ তাঁকে ঠেকাতে পারেনা। কেউ না। একটি জিনিস দেখাও যেটাতে তিনি অক্ষম?

চিন্তা করো, কোনদিন মানুষ কি চিন্তা করেছিলো যে, তারা মেধা-শ্রম ব্যয় করে বাতাসের আগে চলা বিমান তৈরী করে ফেলবে। শব্দেরও আগে নিমিষেই উধাও হয়ে যাবে-এমন বিমান তৈরী করে ফেলেছে মানুষ।

শুধু তাই না, বিশেষ একধরণের থ্রিডি এফেক্ট (ডিপ ফেইক) ও টেকনোলজির উদ্ভাবণ মানুষ করে ফেলতে সক্ষম হয়েছে, যেখানে একজন মানুষ একই সময় বিভিন্ন যায়গায় অবস্থান করবে। এটা আর্টিফেসিয়াল ইন্টেলিজেন্স ও মেশিন লার্নিং এর মাধ্যমেই সম্ভব। কি চিন্তা করে দেখেছো, কতটা অদ্ভুত? তাহলে যিনি বরাবরের মতো সব কিছুর মালিক, খালিক, তিনি এক রাতে আসমানে নিয়ে যাবেন- সেটা কোন ব্যাপার হলো?

–আল্লাহ হলেন সবার বড়, তাঁর চেয়ে বড় কেউ নেই।

আচ্ছা, মুহাম্মাদ ﷺ কেন সর্বশেষ নবী হলেন?

হ্যাঁ, বড় হলে আরও বিস্তারিত জানবে। তবে এখন শুধু এটুকু বলি যে, আসলে রাসূলরা কেন আসলেন পৃথিবীতে যুগে যুগে? নিশ্চয়ই কোন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আছে, সেটা হলো হেদায়াত ও পথনির্দেশনা। রাহবারি করা। ঠিক আছে?

– আলহামদু লিল্লাহ, বুঝলাম।

আর দ্বিতীয় কথা হলো, যখন দেখা গেল বারংবার আসমানী কিতাবগুলো বিভিন্ন উপায়ে অসাধু মানুষের কাছে বিকৃত ও নষ্ট হচ্ছিলো, তখন আসে হিকমাহর প্রশ্ন। আল্লাহর মর্জি হলো, এবার এমন এক রাসূল ও তার সাথে এমন এক কিতাব প্রেরণ করবেন, যেটা এমনতর বিকৃতি ও বিনাশী হবে না।

বাস্তবেই তাই করলেন, এক রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ ও এক কুরআনকে অক্ষয় অমর করে রাখলেন বিশ্ববাসীর কাছে। কিয়ামত পর্যন্ত এই কিতাবের মেয়াদ। আমরা তাই দেখি, কুরআনের অলৌকিকতা ও মু'জিযা সৃষ্টিকুল মাথা পেতে নিয়েছে। কেউ তার কাছে টিকে না। এক অন্যরকম ঐশ্বরিক ক্ষমতা এই নবী ও তাঁর রিসালাহ্র। এজন্যই মূলত তিনি হলেন সর্বশেষ নবী ও রাসূল।

–বুঝে এসেছে?

– আলহামদুলিল্লাহ। অনেক সুন্দর লাগলো ব্যাপারটা।

তাঁকে কেন আমরা ভালোবাসি?

নবীর ভালোবাসা, সে তো মহা সৌভাগ্যের বিষয়। ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ। শুধু তাই নয়; আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস পাকাপোক্ত হবেনা যদি না নবীর ভালোবাসা থাকে। একটু ভাবো, আল্লাহ তা'আলা তার সর্বশেষ রিসালাহ বা বাণী প্রচার করার জন্য একজনকে নির্বাচন করবেন,আর এমন মহা প্রজ্ঞাসম্পন্ন ঐশীবাণী- সেখানে যেমন তেমন লোকের উপর অর্পণ করতে পারেন না তিনি। খুঁজে খুঁজে লোকদের মাঝে সবচে সম্ভ্রান্ত, চরিত্রবান ব্যক্তির সন্ধান করলেন। আর এই গুরুবাণী কাকে দিবেন, সে ব্যাপারে তিনিই ভালো জানেন। তো শেষমেষ পৃথিবীর সকল মানুষের ভীড়ে আরবের মরুর উম্মী নবী মুহাম্মদ কে বাছায় করলেন।

আরও শুনো,

–আমরা জন্মসূত্রে যে ইসলাম পেলাম, তা কি এত সহজ ছিল? দ্বীন ও কল্যাণের পথকে যিনি সুগম করলেন, তিনিই তো সেই মুহাম্মাদ ﷺ। রবের পরিচয় শেখালেন। দরদী নবী, তাঁর দিলে ব্যথা ও ভালোবাসা সবার জন্য । আল্লাহর পরে নবী ﷺ আমাদের ভালোমন্দে সর্বদা উৎকণ্ঠ ও অস্থির থাকতেন সবচে বেশী । তিনি আমাদের মাঝে সর্বোত্তম নমুনা রেখে গেছেন।

মক্কার পাথুরে পথে ঘুরে ঘুরে যখন ইসলামের শান্তির বাণী নিয়ে যেতেন আর লোকেরা অমানুবিক সব আচরণ করতো। তাঁর মনে খুব ব্যাথা লাগতো। ভেবেই তিনি অস্থির হতেন, আমার উম্মাত জাহান্নামে যাবে?

কুরআনের একটি আয়াতে রাসূল সা. এর মনোকষ্ট সুন্দর ফুটে ওঠেছে:

﴿ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ﴾[الكهف:٦]

তারা এ হাদীসকে (কুরআনকে) বিশ্বাস না করলে সম্ভবত তাদের পিছনে ঘুরে তুমি দুঃখে নিজেকে ধ্বংস করে দিবে। (সুরা আল-কাহাফ, আয়াত নং-৬)

তাহলে আমাদের উচিত এমন দরদী নবী মুহাম্মাদ ﷺ কে অন্তর দিয়ে ভালোবাসা; অন্তরে, কাজে-কর্মে সবক্ষেত্রে।

আখিরাত দিবস নিয়ে
শিশুর প্রশ্ন

আখিরাত পরকাল কাকে বলে?

'আখেরাহ' মানেই হলো শেষ। ইয়াওমুল আখিরাহ মানে হলো, শেষ দিবস। সারা জাহানের আদি অন্তের সব্বাইকে সেখানে জিজ্ঞাসাবাদ ও বিচারাচারের জন্য একত্র করা হবে। শেষ বলা অর্থ এরপর আর কোন দিন নেই। হিসাব নিকাশের দিবস। আমরা বড় ছোট সবাইকে এমন দিবসের মুখোমুখি হতে হবে, দুনিয়াতে করা ভালো-মন্দ কাজের হিসাব দিতে। যদি আমরা আল্লাহর অনুগত হই, কল্যাণের কাজে এগিয়ে থাকি, তাহলে প্রতিদানে জান্নাত পাবো ইনশাল্লাহ্ । আবার কেউ যদি অসৎ ও দুষ্টপ্রকৃতির হয়, তবে তাকে সাজাস্বরূপ আযাব ভোগ করতে হবে। এই দিবসেই সব ফায়সালা হবে। মানে দুনিয়ার জীবনের ইতি আর পরকাল জীবনের সূচনা। এই দিবসে হিসাব দেয়ার জন্য রবের পাণে আমরা ধাবিত হবো কবর ছেড়ে। অন্যভাষায় বলে একে- কিয়ামাত। মহাপ্রলয়।

কিয়ামত কেন আমাদের অজানা, কবে ঘটবে এমনতর ঘটনা?

না না, এক আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেনা কিয়ামত কবে ঘটবে। আসলে জানো, কিয়ামতের দিন ক্ষণ কেন আমরা জানিনা বা আমাদেরকে কেন জানানো হয়নি?

হ্যাঁ। যাতে প্রতি মুহূর্ত, প্রতি সেকেন্ডকে কাজে লাগাই, সুন্দর সুন্দর আমল করি, মন্দ কর্ম এড়িয়ে চলি। পরপারের জন্য সার্বক্ষণিক প্রস্তুতি; এটাই তো উদ্দেশ্য। আর যদি সবাই জেনে যেতাম, অমুক সময়, তমুক মুহূর্তে কিয়ামত হবে, তখন কী হতো জানো?

– কী হতো?

– লোকেরা আমল করা ছেড়ে দিতো। অসৎকর্মে মানুষ গা ভাসিয়ে দিতো। বর্তমানে যেমন তারচে বেশী মন্দ কর্ম, অশ্লীলতা ও দুর্গন্ধে পৃথিবীটা ভরে যেত। আর তাওবা? সেটা হতো ঠিক কিয়ামত হওয়ার কিছু আগে! এজন্য ই মূলত কিয়ামতের ব্যাপারটা আমাদের অজানা রয়ে গেছে। কবে ঘটবে কেউ জানেনা? এমনকি রাসূলরাও না। শুধু আল্লাহ তা'য়ালাই জানেন।

কুরআন কী বলছে শুনি তাহলে–

'তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে কিয়ামত সম্পর্কে যে, তা কখন ঘটবে? এর আলোচনার সাথে তোমার কী সম্পর্ক? এর প্রকৃত জ্ঞান তো তোমার প্রতিপালকের নিকট, যে তার ভয় করে তুমি কেবল তারই সতর্ককারী'। (সুরা আন-নাযিয়াত, আয়াত নং-৪৫-৪২)

হিসাব নিকাশ বলতে কী বোঝায়?

ওই যে বলা হলো, আদি অন্ত মানে পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবাইকে আল্লাহ একত্র করবেন। তাদের কাজকর্ম দেখা হবে; ভালো হোক বা মন্দ। সব হিসাব করা হবে। এমনকি তাদের জানিয়েই করা হবে তাদের সামনে। সবশেষে আপন আপন আমলের প্রতিদান হাতে পাবে। ভালো করলে ভালো, আর মন্দ কর্মের জন্য ফলাফল মন্দই পাবে। এর কোন পরিবর্তন হবে না, না না।

কুরআনেরর বাণী অধ্যয়ন করলেই আরও বিস্তারিত জানবে, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা বলছেন– **'বল , তোমরা যে মৃত্যু হতে পলায়ন কর সেই মৃত্যু অবশ্যই তোমাদের সাক্ষাৎ করেব। অতঃপর তোমাদেরকে হাজির করা হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহর নিকট অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন যা তোমরা করতে'**। (সুরা আল-জুমুআহ, আয়ত নং-৮)

'বল, অবশ্যই পূর্ববর্তীগণ এবং পরবর্তীগণও। সকলকে একত্রিত করা হবে এক নির্ধারিত দিনের নির্ধারিত সময়ে'। (সুরা ওয়াকিয়াহ, আয়াত নং-৪৯,৫০)

'অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে, এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে'। (সুরা আয-যালযালাহ, আয়াত নং-৭,৮)

মৃত্যু কী?

বাচ্চার বয়স যদি হয় ছয়ের নিচে তাহলে মৃত্যুর ব্যাপারটি ছোট্ট বাচ্চাকে বোঝানো কিছুটা জটিল। তাকে অনেক ক্ষেত্রে বোঝানোই যাবেনা যে,জীবন্ত প্রতিটি প্রাণীরই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করা লাগবে-ই লাগবে। জীবন-মরণ, পরকালের জন্য উত্থান- এর অর্থ তার বুঝে আসবেনা। বাচ্চার বয়স যদি হয় ছয় থেকে আট, তখন কিছুটা বুঝে আসবে। স্পষ্ট হতে কিছু সময় লাগবে। দশ বছরের বাচ্চাকে বোঝানো যাবে ভালোভাবেই ইনশাআল্লাহ। এটাকেই বলে মৃত্যু। এভাবে আমাদের পূনরুত্থান হবে। মৃত্যু মানেই একবারে শেষ হয়ে যাওয়া নয়। মানে এক জায়গা ছেড়ে ভিন্ন ও সুন্দর জগতে মু'মিন বান্দারা চলে যাবেন। আর পাপিষ্ঠ ও গুনাহগার বান্দা আপন কাজের ফল পাবে। সৎকর্মশীলদেরকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে নয়, বরং রবের সান্নিধ্যে থাকার জন্য-ই মৃত্যুর ব্যবস্থা করা। সুন্দর বর্ণিল-সুজলা-সুফলা জান্নাতের মালিকের পাশে নতুন জীবন যাপনের জন্য । এত সুন্দর জান্নাতে, যা কল্পনাতেও আসেনা।

দশ বছরের কিশোর ততদিনে কোন আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুকে স্বাভাবিক ভাবেই পরখ করবে, সেটা হবে তার জীবনের প্রথম মৃত্যুবাসীকে দেখা। না জানি তার ছোট্ট মনে কত প্রশ্ন ও ভয়ভীতির আনাগুনা হবে এসময়, বিশেষত অন্ধকার কবরের কথা শুনে! আসলেই এসব ব্যাপার শিশুর মনোনজগতে বেশ প্রভাব ফেলে, ভীতিরও সঞ্চার করে। অভিভাবক এজন্য শিশুর কমল মনে মৃত্যুর রেখা আলতো করে শিখিয়ে দিবেন। তবে মিথ্যা ও ছলনার আশ্রয়ে গিয়ে নয়, কোন রকম বোঝ দেয়ার জন্য এটুকুও বলা ঠিক হবে না যে, তিনি সফর করছেন মাত্র (আবার আসবেন), মানুষ তো আজকাল সত্যটাও মিথ্যার মিশেলে শিখাতে চায়। সেগুলো স্থায়ী হয়না।

যাকগে, আরও ভালো হয়, পরিবারের মরার সংবাদ শোনার আগেই তার সাথে যদি জীবজন্তুর মরা নিয়ে একটা অভিজ্ঞতা তুলে ধরা যায়। হতে পারে সেটা মরা ফড়িং ও জীবিত ফড়িং, মরা অন্য যে কোন কীট হতে পারে। এসব বাস্তবিক উদাহরণ তার মনে জীবন্ত করে তুলে মরা-বাঁচার মর্মটা। এরপর তার জন্য বুঝা সহজ হয় যে, মৃতরা আসলে মরে গলে শেষ হয় না; তার জন্য আলাদা জীবন তৈরী হয় এই মরার মধ্য দিয়ে। আমরাও যখন তখন মারা যেতে পারি, মরে তাদের সাথে মিলিত হবো, যারা আমাদের পূর্বেই গত হয়ে গেছেন। তাদের সাথে রবের পাশে জান্নাতি জীবন পাবো ইনশাআল্লাহ।

তাহলে কেন ছোট্ট বাচ্চারা এত ছোটতেই মরে যায়?

সুন্দর প্রশ্ন। জন্মকালে ও জন্মের পরেও অনেক শিশুকে মারা যেতে দেখি। সেটা এজন্য নয় যে, তারা অপরাধী বা পাপী। তারা তো সম্পূর্ণই নিষ্পাপ। অপরাধ করা তো দূরের কথা,অপরাধ ও পাপের কথা তাদের চিন্তায়ও আসেনা। তাহলে তাদের আমলনামার কী হবে? মানে হিসাব নিকাশ? তাই তো?

– হ্যাঁ।

– কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদেরকে আপন রহমতের চাদরে জড়িয়ে নিবেন, জান্নাতের মালিক বানিয়ে দিবেন। ব্যাস। এটাই তাদের হিসাব।

আর আমরা আগেই বলেছি, মানুষ মারা গেলেই সব শেষ হয়ে গেলেও তার আত্মা কিন্তু শেষ হয়ে যায়না, স্থানান্তরিত হয়, প্রতিপালকের নিকট চলে যায়। আর ভালো-ভদ্রজন হলে মানুষের মনে অমর হয়ে থাকে; সুন্দর আমল ও কীর্তির মাধ্যমে। তাহলে শুনি, কী করলে রবের আশ্রয়ে ও জান্নাতে যেতে পারা যায়? শুনবে তো? সদা সর্বদা সুন্দর কথা কর্মে নিজেকে নিয়োজিত রাখবো, ইসলামের রূপরেখা ও বিধিবিধানকে মেনে চলবো। তাহলেই জান্নাত পেয়ে যাবো, ইনশাআল্লাহ।

? আমরা মরে কোথায় যাবো?

খানিক আগেই জানলাম, মৃত্যু মাধ্যমে আমরা জান্নাতে যেতে পারবো, যদি সৎ বান্দা হই। মৃত্যুর পর আমাদের কবরই জান্নাত হয়ে যাবে তখন। নির্দিষ্ট সময়, যেটা আল্লাহ লিখে রেখেছেন, ততদিনই আমরা দুনিয়াতে থাকবো। এরপর কবরে যাবো ইনশা আল্লাহ। তখন কবরটা জান্নাতের বাগান হবে মু'মিন বান্দার জন্য, পৃথিবীতে যার স্বালাত সিয়াম ঠিক ছিল, রবের প্রতি পূর্ণ আস্থা ছিলো। এমন বান্দা কবরে গিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত সুখে শান্তিতে থাকবে।

? আচ্ছা, মৃতরা কি দেখতে শুনতে পায়? মাটির নিচে তারা কিভাবে নিশ্বাস নেয়? তারা কি খাবার খেতেও পায়?

হ্যাঁ বাবা, মৃতরা কথা শুনেন, সালাম পাঠ করলে তাও শুনেন, তাদের কাছে দু'আও পৌঁছে যাবে যখন আমরা তাদের জন্য দু'আ করবো। তবে আমাদের বর্তমান জীবনের মতো শ্বাস-নি:শ্বাস নিবে না, কোন খাওয়া দাওয়াও নেই, ঘুম নেই, অফিসের কোন কাজকর্মও নেই। আখেরাতের প্রথম ধাপ হলো এই কবর। তাদের বিশেষ কিছু ধরাবাঁধা নিয়ম আছে, তবে দুনিয়ার মতো না।

তাদের এ জগতকে বলা হয় বারযাখ। বারযাখি জগতে শ্বাস-প্রশাস, খাওয়া দাওয়া, ঘুমের কোন কারবার নেই। যত পারবে শুধু নেয়ামতরাজি ভোগ করবে। তবে মন্দ লোকরা আযাবের ভাগিদার হবে।

জান্নাত কী? কী আছে এতে?

জান্নাত, সে তো শান্তির জায়গা, শুধু শান্তি আর শান্তি। এত অনিন্দ্যসুন্দর জায়গা যেখানে তুমি যা চাইবে তাই পাবে।

–যা খুশি তাই?

–হ্যাঁ, যা খুশি তাই। তবে সেটা শুধুমাত্র সৎকর্মশীলদের জন্য, জান্নাত অসৎলোকদের জন্য না। মু'মিন বান্দারা জান্নাতের বিভিন্ন স্তরে থাকবে,যার যার আমলের স্তর ও আল্লাহর দয়ার পরিমাণ অনুযায়ী। সবচে যিনি সৎ ও আমলদার হবে, তার জন্য জান্নাতের সবচে ভালোটা থাকবে, এরপর আমলের স্তর অুনযায়ী তুলনামূলক ছোট জান্নাত পাবে।

তবে জান্নাতের সুবাস, শান্তি, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও দেখা সবাই পাবে। আর ইচ্ছেমতো খাবার দাবার, আনন্দ-বিনোদন, সুখবিলাস আরও কত কী! কোন কাজের ক্লান্তি থাকবে না, অসুস্থও হবোনা। কী দারুণ, তাইনা?

আর সবচে আনন্দের বিষয় হলো, আল্লাহর সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দিদার লাভ করা, তাকে দেখতে পাওয়া। নবী রাসূলসহ প্রিয় যে কারোর সাথে সাক্ষাৎ লাভ করা।
জাহান্নাম কী? এর সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী?

জাহান্নাম, এখানে আগুনের লেলিহান শিখা ও তার শাস্তি। এটা তৈরীই করা হয়েছে মন্দ লোকদের শাস্তি দেয়ার জন্য । যারা মানুষকে কষ্ট দেয়, আল্লাহর অবাধ্য হয়, তাঁর আদেশ-নিষেধ পালন করেনা, তাদেরকে শায়েস্তা করা হবে জাহান্নামে।

মৃত্যু-পর অন্যান্য প্রাণীর কী হবে, জান্নাতে না জাহান্নামে যাবে তারা?

না, মানুষ ও জ্বিন জাতি বাদে বাকী যত মাখলুক আছে, তারা আল্লাহর আদেশ নিষেধের পাত্র নয়। তারা মূলত মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্ট ও নিয়োজিত। এজন্য তাদের হিসাব নেই বিলকুল। শাস্তিও নেই। তবে কিয়ামতের দিন তাদেরও হাজিরা দেওয়া লাগবে, সেটা নিজেদের মাঝে মারামারি ও হানাহানির কারণে, তখন শিং ওয়ালা গরুর জবানবন্দি নেয়া হবে, কেন সে শিংবিহীন নিরীহ গরুকে আঘাত করলো?! এসব পশুদের হিসাব শেষ হলে তাদের তিনি বলবেন, তোমরা মাটি হয়ে যাও। তখন তারা সবাই মাটি হয়ে যাবে।

তাকদীর নিয়ে করা
শিশুদের প্রশ্নাবলী

কৃযা কৃদর (তাকদীর) বলতে কী বুঝি?

তাকদীরের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস করা ঈমানের অন্যতম রুকন। আল্লাহ তায়ালা বলেন: **'তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে পরিমিত করেছেন যথাযথ অনুপাতে'**। (সুরা আল-ফুরকান, আয়াত নং-২)। কৃযা কদর বলতে বুঝায়: পৃথিবীর প্রতিটি বিষয় সৃষ্টি হওয়ার আগেই এর বিস্তারিত জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার রয়েছে। তিনি এগুলো বিস্তারিতভাবে লাওহে মাহফুযে লিখে রেখেছেন। তাঁর চাওয়া ছাড়া কোন কিছুই সংঘটিত হয় না। তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।

কিভাবে আল্লাহ কিছু ঘটার আগেই সব জেনে ফেলেন?

আচ্ছা, তোমাদের একটি উদাহরণ দেই। একজন একটা খেলনা বানালো। সে অবশ্যই জানে খেলনাটা কোন কাজে লাগবে। কারণ সে-ই তো এটি প্রস্তুত করেছে। এর কোন অংশের কী কাজ তাও সে নির্ধারণ করেছে। অতএব, খেলনার সক্ষমতা ও কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে প্রস্তুতকারক পরিপূর্ণ জ্ঞাত হবেন এটিই তো স্বাভাবিক। যে মানুষ এত কিছু করতে পারে তার স্রষ্টা কিন্তু আল্লাহ তা'আলা। তাঁর ক্ষমতা অসীম, তিনি জ্ঞানের আধার এবং তাঁর প্রতিটি সৃষ্টি পূর্ণাঙ্গ। তিনি নিজ জ্ঞানের মাধ্যমে প্রতিটি সৃষ্টি সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত; সৃষ্টির পূর্বের অবস্থা জানেন, সৃষ্টিকালীন অবস্থা জানেন আরও জানেন সৃষ্টি করার পর তা কেমন হবে সে সম্পর্কে। আবার আল্লাহ তা'আলা যেমন মানুষের স্রষ্টা তেমনি তিনি স্থান ও কাল সৃষ্টি করেছেন। তাই তো তিনি জানেন অতীতে যা ঘটেছে, বর্তমানে যা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে যা ঘটবে। সব, সবকিছু।

নিজকর্মে মানুষ কি বাধ্য-মাজবুর? তার নিজের স্বাধীনতা বলতে কিছু কি নেই?

তোমাদের একটা প্রশ্ন করি, মানুষ কখন পৃথিবীতে আসবে, কখন মারা যাবে, কতদিন বা এখানে অবস্থান করবে– এগুলো কি সে নিজে নির্ধারণ করতে পারে? অসম্ভব..তাই না? আবার তার পিতা-মাতা কে হবেন, আত্মিয়-স্বজনই বা কারা হবেন– এগুলো কি তার ইচ্ছাধীন বিষয়? আদৌও না.. তার মানে এগুলোতে আমরা বাধ্য। কোন ইচ্ছাশক্তির স্থান এখানে নেই।

এবার আরও কিছু বিষয় দেখি। সলাত আদায়ের ক্ষেত্রে আমরা স্বাধীন। ইচ্ছে হলে আদা করবো, না হলে আদা করবো না। বাধ্য করার কেউ নেই। মু'মিন কাফির হওয়ার বিষয়টিও অনেকটা এরকম। তার মানে এ বিষয়গুলোতে আমরা বাধ্য নই। ইচ্ছাশক্তির স্থান এখানে

আছে। স্বাধীনতা আছে। তবে মনে রাখতে হবে, আমাদের ইচ্ছাশক্তি আল্লাহর ইচ্ছাশক্তির অধীন। এ বিষয়টি আরেকটু বুঝিয়ে বলি। ভালোভাবে শোন। ধরো, কেউ সলাত আদায়ে ইচ্ছা করল। আল্লাহ চাইলে তাকে এ থেকে বিরত রাখতে পারেন। তাঁর সেই ক্ষমতা আছে। আবার কেউ কোন কিছু পরিত্যাগ করার ইচ্ছা করল। আল্লাহ চাইলে এ থেকে তাকে বিরত রাখতে পারেন। তাঁর সেই ক্ষমতাও রয়েছে। কিন্তু তিনি ফায়সালা করে দিয়েছেন, বান্দার স্বাধীনতা ও ইচ্ছাশক্তি থাকবে। তার যাবতীয় হিসাব হবে এই স্বাধীনতার উপর ভিত্তি করে। রাব্বে কারীম কুরআনে এটিই বলেছেন:

وَمَا تَشَآءُوْنَ إِلَّآ أَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ

তোমরা কিছুই ইচ্ছা করে কিছই করতে পার না যদি জগত সমূহের প্রতিপালক আল্লাহ ইচ্ছা না করেন। (সুরা আত-তাকবীর, আয়াত নং-২৯)

বিষয়টি যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ তাই চলো, আরও ভালোভাবে এটি বুঝার চেষ্টা করি। ধরো, তোমার বাবা তোমাকে একটি কাঁচের বোতল দিয়ে বলল: বৎস! তুমি এই বোতলটি মাটিতে ছুঁড়ে ভেঙে টুকরো টুকরো করতে পারবে কি?

– অবশ্যই পারবো। এটা তো খুবই সহজ।

– ভাঙছো না যে তাহলে?

– এটি ভুল। এটি করা অনুচিত।

– বৎস! আল্লাহ তা'আলা অনন্তকালে জানেন যে, তুমি এ বোতলটি ভাঙবে না। কারণ তুমি ভালো ছেলে। আবার খারাপ ছেলেটি বোতলটি আঁছড়ে মেরে টুকরো টুকরো করে ফেলবে এটিও আদিকালে তিনি জানেন।

– আচ্ছা, বোতলটি জমিনে ছুঁড়ে মারতে কেউ কি তোমাকে বাধা দিয়েছে? কিংবা দুষ্ট ছেলেটিকে কেউ কি বাধ্য করেছে সেটি ভেঙে ফেলতে? আলবৎ না.. সৎপথ গ্রহণ এবং সৎপথ হতে বিচ্যুত হওয়ার বিষয়টি ঠিক এমনই। এ ক্ষেত্রে মানুষ পরিপূর্ণ স্বাধীন।

– দেখ বৎস! মানুষের জন্য আল্লাহ তা'আলা কী লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন তা কিন্তু সে জানে না। তাকদীরের লিপি জানার দায়িত্বও তোমাকে দেয়া হয় নি। আল্লাহর জ্ঞান পরিপূর্ণ ও সবকিছুকে ব্যপ্ত, তিনি সবকিছুর ভাগ্য লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন– এ বিষয়ের প্রতি ঈমান আনা তোমার কাজ। তুমি জিজ্ঞেসিত হবে তোমার ইচ্ছাশক্তি সম্পর্কে, রবের আদেশ-নিষেধ কতটুকু পালন করেছো; সে বিষয়ে। কারণ এগুলো তোমার ইচ্ছাধীন ও ক্ষমতার আওতাভুক্ত বিষয়।

আল্লাহ কেন কিছু লোককে হিদায়েত দেন আবার কিছুকে দেন না?

আল্লাহ তা'আলা কিন্তু সকল মানুষের সামনে সঠিক পথ স্পষ্ট করে দিয়েছেন। চলো, আল-কুরআনের একটি আয়াত দিয়ে আমরা এর উত্তর শুরু করি। রাব্বে কারীম বলেন: **'আর আমি কি তাকে দু'টি পথ দেখাইনি?** (সুরা আল-বালাদ, আয়াত নং-১০) আলোচ্য আয়াতে হিদায়াতের অর্থ হল: তিনি মানুষের জন্য সঠিক পথের দিশাবাহী হিদায়েত বাতলে দিয়েছেন। যাতে সত্য-মিথ্যা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। আলাদা হয়ে গেছে দুটোর গতিপথ। আবার আল্লাহ তা'আলা মানুষকে নির্বাচনের স্বাধীনতা দিয়েছেন। সে চাইলে নিজের জন্য মুস্তাকিমের পথ চয়ন করতে পারে। তাই তো আমরা দেখি, কেউ সঠিক পথ নির্বাচন করছে আবার কেউ বেছে নিচ্ছে বেঠিক পথ। আমাদের চারপাশে এমন দৃশ্য অহরহ দেখি। তাই না? ঠিক তাই.. আমরা যেন সঠিক পথ বেছে নিতে পারি, আল্লাহ তাওফীক দিন।

– আমীন ইয়া রাব্ব!

এটা যদি পূর্ব-নির্ধারিত হয়েই থাকে যে- কেউ কেউ ভুলপথে চলবে আর অবাধ্য হবে- তাহলে সাজা দেয়া হচ্ছে কেন?

চলো, প্রথমে একটি উদাহরণের সাহায্যে এই বিষয়টা বুঝার চেষ্টা করি। ধরো, এক লোক কোন এক দেশে সফর করতে চাই। সেই দেশে যাওয়ার দুটি পথ রয়েছে। প্রথমটি নিরাপদ আর দ্বিতীয়টি অনিরাপদ। বলতো, সে কোন পথটি বেছে নিবে?

– অবশ্যই নিরাপদটি..

তেমনি আখিরাতের পথ চলায় জান্নাতে পৌঁছার নিরাপদ পথটি মানুষকে বেছে নিতে হবে। সেই নিরাপদ পথ হল: আল্লাহর আদেশগুলো মেনে চলা আর নিষিদ্ধ বিষয়গুলো হতে বিরত থাকা। অনিরাপদ পথ নির্বাচন তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে নিশ্চিতভাবে।

আরেকটি বিষয় লক্ষ্য কর, তাকদীরের লিপিকে প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করালে আমরা কিন্তু কোন অপরাধীকে ধরতে পারব না। কারণ সে-ও অপরাধকে বৈধ করতে তাকদীরের লিপিকে

ঢাল হিসেবে ব্যবহার করবে। বলবে, আমার ভাগ্যে এটা লিখা ছিল বলে আমি তা করেছি। অতএব, আমি নিরাপরাধ নির্দোষ। কী বলো তোমরা?

– সত্যিই তো যৌক্তিক বিষয়..

তবে ভাগ্যলিপিকে আমরা আমাদের বিগত কাজের ক্ষেত্রে প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করাতে পারি। যেমন: সর্বোচ্চ সর্তকতা সত্ত্বেও গতকাল একটি দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। অনেক ক্ষতি হয়েছে। বলবো, তাকদীরে ছিল বলেই এমনটি ঘটেছে। তাহলে সবর করতে পারব, আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকায় মানসিক প্রশান্তি লাভ করব। কিন্তু ভবিষ্যতের কোন বিষয়ে তাকদীরের প্রসঙ্গ টেনে আনার কোন সুযোগ নেই। এটি বলতে পারব না 'ভাগ্যলিপিতে লিখা নাই। বিধায় আমি এটি করব না'। কারণ ভাগ্যলিপি জানার কোন সুযোগ কারোর নেই। ঘটে গেলেই কেবলমাত্র জানা সম্ভব।

আদিতে আল্লাহ কী লিখে রেখেছেন আর কী লিখে রাখেন নি– এটি তো তাঁর জ্ঞানে রয়েছে। এ বিষয়ে মানুষের জ্ঞান শূণ্যের কোঠায়। লোকমুখে এ বিষয়ে যা কিছু প্রচারিত তা ধারণাপ্রসূত আর অজ্ঞতা থেকে উৎসারিত। দুনিয়ার জীবনের কর্মানুপাতে বান্দার হিসাব হবে। ভাগ্যলিপি জেনে তা অনুযায়ী আমল করবে আর পার পেয়ে যাবে– এটি অসম্ভব। কারণ বান্দার অদৃশ্যের বিষয় জানার বিন্দুমাত্র কোন সুযোগ নাই। এজন্য তার দায়িত্ব আল্লাহর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকা আর তাঁর ইচ্ছার অধীনে নিজেকে সঁপে দেয়া। রাব্বে কারীম বলেন: **'তিনি যা করেন সে বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করা যাবে না; বরং তাদেরকেই প্রশ্ন করা হবে।** (সুরা আল-আম্বিয়া, আয়াত নং-২৩)

সৃষ্টি যার আদেশ চলবে তারই।

আল্লাহ কেন আমাদের পয়দা করেছেন? পৃথিবীর সৃষ্টির মূল কী? প্রাণীজগতই বা তিনি কেন সৃজিলেন?

আচ্ছা, আমাদের চারপাশে মানবসৃষ্ট যা কিছু আছে সবকিছু কোন না কোন উদ্দেশ্যে তৈরী। কোন কিছুই অর্থহীন নয়। তাই নয় কি? অবশ্যই.. তাহলে মানব সৃষ্টির পেছনেও আল্লাহ তা'আলার মহৎ উদ্দেশ্য থাকাটা স্বাভাবিক। রবের ভাষায় শোনা যাক: **'আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন ও মানুষকে এজন্য যে, তারা একমাত্র আমারই ইবাদত করবে।** (সুরা আয-যারিয়াত, আয়াত নং-৫৬) তিনি আমাদেরকে পয়দা করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য। আর এটি আমাদের জন্য উপকারী ও কল্যাণকর। কারণ আখিরাতে ফলাফল নির্ধারিত হবে আমল তথা আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী কে কতটুকু করেছে তদানুযায়ী। সৎকর্মশীলদের জন্য থাকবে জান্নাত। আর অসৎকর্মশীলদের জন্য জাহান্নাম।

আর এই মহাবিশ্ব.. এর সবকিছু আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি। এটি খুবই সূক্ষ্মভাবে তৈরী। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল তিনিই বানিয়েছেন। আসমানে ছড়িয়ে দিয়েছেন গ্রহরাজি। তারকারাজিকে করেছেন পথিকের পথনির্দেশক আর আসমানের সৌন্দর্য। সূর্যের দিকে দেখ। কেন এর সৃষ্টি?

আমাদের উষ্ণতা দেবার জন্য, উদ্ভিদ গজানোতে ভূমিকা পালন আর জীবাণু ধ্বংস করার জন্য। সুবহান আল্লাহ!

আর প্রাণীজগতের কথা.. একে তো আল্লাহ তা'আলা মানুষের বশীভূত করে পাঠিয়েছেন। মানুষ তার মাংস ভক্ষণ করে, তার উপর আরহণ করে দূরের পথ পাড়ি দেয়। তিনি আমাদেরকে এটি জানিয়েছেন: **'তোমাদের আরোহণের জন্য ও শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন অশ্ব, খচ্চর ও গাধা এবং তিনি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু, যা তোমরা অবগত নও।** (সুরা আন-নাহল, আয়াত নং-০৮) জমিনকে বসবাসের উপযোগী করেছেন। সকল কিছু প্রস্তুত করেছেন মানব সৃষ্টির আগেই তার জন্য বিশেষ সম্মান হিসেবে। আবার এই সব সৃষ্টিই রবের প্রশংসাগীতি গায়। এর মাধ্যমে তারা তাঁর ইবাদত করে। রবের ভাষায়: **'সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং তাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না; কিন্তু তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পার না; নিশ্চয়ই তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।** (সুরা আল-ইসরা, আয়াত নং-৪৪) বিষয়গুলো কিন্তু ভাবনার জগত খুলে দেয়। আমাদের আরও ভাবতে শেখায়।

? যারা নবীদের পায়নি, তাদের কী হবে?

তারা কিয়ামতের দিন প্রশ্নের মুখোমুখি হবে। হিসাবের সম্মুখীন হবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বিবেক দিয়েছেন। বিচার দিবসে তাদেরকে তিনি পরীক্ষা করবেন, আদেশ করবেন। যদি তারা তাঁর ডাকে সাড়া দেয়, তাঁর আনুগত্য করে, তাহলে জান্নাতে যাবে। আর তাঁর নাফারমানী করলে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

? 'অনিষ্ট ও কুকর্ম' এগুলো কিভাবে আসল?

একটি উপন্যাস কল্পনা করি। যার দুটি চিত্রনাট্য রয়েছে। প্রথম চিত্রনাট্যে আলোচিত হয়েছে চরিত্রের পটভূমি, এর কাজ-কর্ম ও পরীক্ষা সম্পর্কে। আর দ্বিতীয়টিতে এর হিসাব ও প্রতিদান সম্পর্কে। মানুষের জীবনটা সেই উপন্যাস তুল্য। যার প্রথম চিত্রনাট্য দুনিয়া। এটি পরীক্ষার গৃহ। এখানে সবাইকে পরীক্ষা দিতে হবে; আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলা বা তাঁর অবাধ্য হওয়া। আর দ্বিতীয় চিত্রনাট্য আখিরাত। এটি হিসাব ও প্রতিদানের স্থান। এখানে অত্যাচারীদের থেকে অত্যাচারীতদের হরণকৃত অধিকার ফিরিয়ে দেয়া হবে। সবকিছুর চুলচেরা বিচার হবে। কারও প্রতি ন্যূনতম অবিচার করা হবে না।

এখন বিষয়টি কল্পনা করা সহজ। দুনিয়ার বুকে অনিষ্ট লোকের বিচরণ, অপরাধ করেও পার পেয়ে যাওয়া, শাস্তি না হওয়া– এ সবকিছু পরীক্ষা। এখানেই সবকিছু শেষ হয়ে যাবে না। অবশ্যই ক্বিয়ামতের দিন সবাইকে একত্র করা হবে প্রত্যেককে নিজ নিজ কর্মের প্রতিদান দেয়ার জন্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন: **'অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে, এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে'**। (সুরা আয-যালযালাহ, আয়াত নং-৭,৮)

দুষ্ট লোকেরা পৃথিবীতে জন্ম নেয় কেন?

আল্লাহ তা'আলা মানব সৃষ্টি করেছেন। তাকে ভালো-মন্দ কাজ করার স্বাধীনতা দিয়েছেন। তুমি ভদ্র হতে পারো আবার অভদ্রও হতে পারো। কিন্তু এর দায়ভার তোমাকেই বহন করতে হবে। এই স্বাধীনতা যেমন একদিক থেকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে বিশাল নেয়ামত। আবার এর অন্তরালে রয়েছে রবের পরিপূর্ণ হিকমাত। কারণ এটিই মানুষের পরীক্ষার কেন্দ্রবিন্দু।

খারাপ লোকেরা ভালো হতে পারবে। সেই স্বাধীনতা আল্লাহ তাদেরকে দিয়েছেন। আমাদের ভূমিকা হবে, তাদেরকে ভালো হতে সাহায্য করা। যদি তারা তা প্রত্যাখান করে আর খারাপের উপর অটল থাকে, তাহলে আমাদের কর্তব্য মানুষদের থেকে তাদের অনিষ্ট প্রতিরোধ করা। এতে আমরা রবের ভালোবাসা পাবো আর অধিকারী হবো তাঁর প্রতিদানের। পার্থিব জীবনের সব কিছুর স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা। আর এই পার্থিব জীবন আমাদের জন্য একটি পরীক্ষাগার। রবের ভাষায়: **'যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করবার জন্য- কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক দিয়ে সর্বোত্তম'**। (সুরা আল-মুলক, আয়াত নং-০২)

শয়তান অনিষ্ট সাধন করবে, পথভ্রষ্ট আদম সন্তানেরাও অনিষ্ট সাধন করবে– এটিও পার্থিব জীবনের এক প্রকার পরীক্ষা।

কিছু মানুষ বিকলাঙ্গ, বিকৃত বা কুৎসিত হয়ে জন্মায় কেন?

সুরা মুলকের ২নং আয়াত নিশ্চয় তোমাদের মনে আছে। ঐ যে.. জীবন-মৃত্যুর সৃষ্টি পরীক্ষার জন্য; কে ভালো আমল করে। যাকে যা দেয়া হয়েছে বা দেয়া হয়নি সবই তার জন্য পরীক্ষা। এখন আসো মূল প্রশ্নে যাই। প্রথমত: এটি তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে পরীক্ষা। তিনি দেখতে চান তারা ধৈর্যধারণ করে নাকি রবের প্রতি বিতশ্রাদ্ধ হয়। দ্বিতীয়ত: সবর করলে এর মাধ্যমে তিনি আখিরাতে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন। তৃতীয়ত: তাদের মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের পরীক্ষা নিতে চান। দেখতে চাচ্ছেন, সুস্থতা নামক বিশাল নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা আমরা প্রকাশ করি কিনা? চতুর্থত: এর মাধ্যমে তিনি স্মরণ করিয়ে দিতে চান যে, আমরা তাঁর ক্ষমতার সামনে অতীব দুর্বল। যেন আমরা আমাদের ক্ষমতা নিয়ে প্রতারিত না হই। বরং বিনয়ী হই, একে অপরকে সহায়তা করি। পরিশেষে, হিসাব দিবসের পরে সৎকর্মশীলরা নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতে চিরস্থায়ী সুস্থতার জীবন যাপন করবে, বি ইযনিল্লাহ। আশা করি এবার তোমাদের নিকট বিষয়টি পরিষ্কার?

– সুবাহান আল্লাহ! আল্লাহ তা'আলার হিকমাত কতই না পরিপূর্ণ!!

ধনী-গরীবের এই বিভেদ কেন? শুধু এটিই নয়; বরং কিছু খারাপ লোক অট্টালিকায় বাস করে আবার ভালো লোকের জায়গা হয় কুঁড়ে ঘরে, পৃথিবীটা এমন কেন?

আচ্ছা বলতো, পার্থিব জীবনে রিযিক বলতে যা কিছু আছে তা কার দান? তোমাদের নিশ্চিত উত্তর, মহান রবের দান। এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ কিন্তু তাঁর বান্দাদের পরীক্ষা করে থাকেন। আমরা দেখি, কখনও ভালো মানুষকে অঢেল রিযিক দান করেন। দেখতে চান, সে অন্যদের তা থেকে দেয় নাকি কৃপণতা করে তা জমা করে রাখে? এই ক্ষণস্থায়ী জিন্দেগীতে ভালো বান্দা যত বেশি ধৈর্যের সাথে জীবন যাপন করবে, ক্বিয়ামতের দিন তার প্রতিদান তত বিরাট হবে। কিন্তু যে মানুষ অঢেল রিযিক পাওয়ার পরেও অন্যদের তা থেকে দান করে না। বরং কেউ চাইতে আসলে তার সাথে দুর্ব্যবহার করে। ক্বিয়ামতের দিন তাকে শাস্তি দেয়া হবে। কারণ সে আল্লাহর নেয়ামতের যথাযাথ শুকরিয়া আদায় করে নি। সেটির কদর করে নি।

আমাদের চারপাশে তাকালে কী দেখি? দেখি, চারপাশের মানুষকে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন স্তরে ভাগ করেছেন। ধনী-গরীব, দুর্বল-সবল, প্রাণবন্ত-অলস, মুনিব-ভৃত্যের সমাবেশ দেখি। কিছু লোককে প্রাচুর্যবান করেছেন গরীবদের প্রতি যাতে তারা সদয় হয়। সবলরা দুর্বলদের যেন সহায়তা করে। সব কিছুতে মানুষদের মাঝে যে প্রভেদ আমরা লক্ষ্য করি তা মূলত আল্লাহর হিকমাতের অংশ। কত ভাষাভাষী লোক যে এ ধরায় আছে তার কোন ইয়ত্তা নেই! আবার বর্ণেও মানুষ বিভিন্ন গোত্রভুক্ত; কেউ শেতাঙ্গ, তো কেউ কৃষ্ণাঙ্গ আবার কেউ গৌর বর্ণের, কেউ বা আছে বাদামী বর্ণ নিয়ে, কারো আবার মিশ্র বর্ণ। মানুষ জাত-কুলে ভিন্ন, মেজাজ-স্বভাবে ভিন্ন। কেউ প্রাণবন্ত তো কেউ আবার অলস প্রকৃতির। কেউ নিজের উপর অন্যকে প্রাধন্য দেয় আবার কাউকে দেখি চরম স্বার্থপর। কারো বদান্যতার সুখ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, কেউ

আবার কৃপণ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ধন-সম্পদের মত বৈষয়িক বিষয়াদিতেও মানুষের মাঝে প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। কেউ ধনী তো আবার গরীব। আর এ সবকিছু আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে পরীক্ষা। প্রাচুর্যতা যেমন পরীক্ষা দারিদ্রতাও তেমনি পরীক্ষা। তিনি কাউকে সম্পদ দিয়ে পরীক্ষা করেন। দেখতে চান, সে তাঁর পথে খরচ করে কিনা? ঠিকঠাক যাকাত বের করে কিনা? বদান্য হয় কিনা? সাদকার হাতটা প্রশস্ত করে কিনা? আবার কাউকে সম্পদ না দিয়ে পরীক্ষা করেন। দেখতে চান, সে ধৈর্য ধারণ করছে কিনা? রিযিকের জন্য মেহনত করে কিনা? পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে রিযিকের অন্বেষায় ছুটে কিনা? দারিদ্রতার জন্য ঘুষ গ্রহণের মত অপরাধে জড়িত হয় কিনা? নাকি চৌর্যবৃত্তিতে জড়িয়ে পড়ে? সব, সবকিছু আল্লাহর পক্ষ হতে পরীক্ষা। কিন্তু একদিকে আল্লাহ তা'আলা যেমন রিযিকের দায়িত্ব নিয়েছেন; তিনি রিযিক দিবেনই দিবেন। অপরদিকে প্রাচুর্যতা বা দারিদ্রতা জান্নাত বা জাহান্নামে প্রবেশে অন্তরায় হবে না। কেউ ধনী হলে সে জান্নাতে যেতে পারবে না বা দরিদ্র হলে জাহান্নামে যাবে – বিষয়টি এমন নয়। যার যতটুকু আছে তাতে সে দায়িত্ববান। তদনুযায়ী হিসাব হবে তার।

আচ্ছা, মানুষ সবাই যদি প্রাচুর্যবান হত, তাহলে কেউ কারো কথা শুনত না, কেউ কাউকে মানত না। একজনের অপরজনের নিকট কোন প্রয়োজন হত না। তাই নয় কি? অবশ্যই.. রাব্বে কারীমের ভাষায় শুনি: **'আমিই তাদের মধ্যে জীবিকা বন্টন করি তাদের পার্থিব জীবনে এবং একজনকে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করি যাতে একে অপরের দ্বারা খেদমত লাভ করতে পারে'**। (সুরা আয-যুখরুফ, আয়াত নং-৩২)

মানুষ বিভিন্ন স্তরের হওয়ায় জীবনের চাকা সচল আছে। এটিই আল্লাহ তা'আলার হিকমাত। সবাই এক স্তরের হলে জীবনের চাকা বন্ধ হয়ে যেত। চলত না।

আমরা অসুস্থ হই কেন? কেনই বা বিপদ-আপদে পতিত হই?

প্রথমত: এটি রবের পক্ষ হতে বান্দার জন্য পরীক্ষা। তিনি দেখতে চান, অসুস্থ হয়ে বান্দা সবর করে নাকি ক্রুদ্ধ হয়? আল্লাহ তা'আলা কিন্তু ধৈর্যশীলকে অঢেল প্রতিদান দিবেন। কিয়ামতের দিন মু'মিন বান্দা তা নিয়ে কি যে খুশি হবে তা বর্ণনা করা যাবে না!

দ্বিতীয়ত: অসুস্থতা, বিপদ-বালা বা দুঃখ-কষ্ট আল্লাহ দেন এর মাধ্যমে বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য। এর মাধ্যমে তিনি আমাদের অন্তর ও চরিত্রকে প্রবঞ্চনা, অহমিকার মত কালিমা হতে পবিত্র করতে চান। যাতে আমরা আমাদের শক্তি নিয়ে প্রতারিত না হই। অহংকার না করি আমাদের সুস্থতার অবস্থা নিয়ে।

তৃতীয়ত: রোগ-বালাই হলে বান্দা দু'আ বাড়িয়ে দেয়, সবর করে। এর মাধ্যমে সে রবের নিকটবর্তী হয়। তার ঈমান বেড়ে যায়। নেকীর পাল্লা ভারী হতে থাকে। তার প্রতি রবের ভালোবাসা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে।

চতুর্থত: মানুষ যাতে অনুধাবন করে সুস্থতা নামক নিয়ামতের মূল্য; এজন্য তিনি মাঝে মাঝে তাকে রোগ-বালাই দিয়ে পরীক্ষা করেন।

দ্বিতীয় বিষয়টি আমরা একটি উদাহরণের সাহায্যে বুঝার চেষ্টা করি। তোমরা গাড়ি দেখেছো নিশ্চয়; বাস, ট্রাক, মাইক্রো, কার ইত্যাদি। এই গাড়িগুলো কেন তৈরী করা হয়েছে? চলার জন্য, তাই নয় কি? প্রস্তুককারক কোম্পানীগুলো এতে ব্রেক সেট করেছে। কিন্তু কেন? এটি কি গাড়ির চলার ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক নয়?

ব্রেক ব্যবহার গাড়ির নিরাপত্তার জন্য জরুরী। গাড়ির আরোহীদের জন্য আরও বেশি জরুরী। গাড়ি তো তৈরী করা হয়েছে চলার জন্য। কিন্তু উপযুক্ত সময়ে ব্রেক না করলে যাত্রীসমেত গাড়ি ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। বিপদ-আপদের বিষয়টি ঠিক এমনই। গাড়ির জন্য যেমন ব্রেক মানুষের জন্য বিপদ-আপদ ব্রেকের কাজ করে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের পয়দা করেছেন যাতে তাঁর ইবাদাত করে আমরা সৌভাগ্যবান হই। তাঁর নিয়ামত পেয়ে ধন্য হই।

বিপদ-বালা তিনি সৃষ্টি করেছেন। ইবাদতের যে মহান উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেই উদ্দেশ্য সম্পর্কে উদাসীন বান্দাকে সতর্ক করার জন্য তিনি বিপদ-আপদ দিয়ে তাকে পরীক্ষা করেন। যাতে সে উদাসিনতা হতে সতর্ক হয়ে রবের স্মরণে ফিরে যায়, তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, সবর করে এবং নেকীর আশা করে।

আল্লাহ তা'আলাই কি কষ্টদায়ক প্রাণী ও কীটপতঙ্গ সৃষ্টি করেছেন?

সবকিছুর স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা। তিনিই সকল কিছুর প্রতিপালক। এটি তো সুবিদিত বিষয়। তাই না? হ্যাঁ.. তিনি যেমন নিজ ক্ষমতায় এই বিশাল সৃষ্টিজগত পয়দা করেছেন, তেমনি এই সৃষ্টির পেছনে রয়েছে তাঁর পরিপূর্ণ হিকমাত। কারণ তিনি আল-হাকীম (মহা প্রজ্ঞাময়) আল-আলীম (মহা জ্ঞানী)। তিনি তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে যা জানেন আমরা তা জানি না। তিনি আমাদের যে জ্ঞান দিয়েছেন তাঁর জ্ঞান এবং প্রজ্ঞার তুলনায় তা একেবারে নগন্য, অতি ক্ষুদ্র। এটি তিনি আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন: **'এবং তোমাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে সামান্যই'**। (সুরা আল-ইসরা, আয়াত নং- ৮৫)

তাই তো এই প্রাণীজগত সৃষ্টির পিছনে আল্লাহ তায়ার যতগুলো হিকমাত রয়েছে সবগুলো আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। কিছু হিকমাত আমরা খোঁজার চেষ্টা করতে পারি। যথা: (এক) সৃষ্টিতে তাঁর শিল্প নিপুণতার প্রকাশ এবং সৃষ্টিজগতকে তিনি কত নিপুণভাবে পরিচালনা করেন তার বহিঃপ্রকাশ। (দুই) এত অগণিত সৃষ্টি সবাইকে তিনি রিযিক দেন। (তিন) তিনি এগুলোর মাধ্যমে বান্দাদের পরীক্ষা করেন। এগুলোর দ্বারা কেউ আক্রান্ত হলে তাকে প্রতিদান দেন। কেউ হিংস্র প্রাণী হত্যা করলে তার বীরত্ব প্রকাশ পায়। (চার) মানুষের চেয়েও অতি ক্ষুদ্র প্রাণীর দংশনে তার কষ্ট পাওয়া বা অসুস্থ হওয়া প্রমাণ করে সে অতি দুর্বল ও তার ক্ষমতা অতি সীমিত। (পাঁচ) চিকিৎসা বিজ্ঞান বলছে, সাঁপের বিষ থেকে উপকারী অনেক ঔষুধ প্রস্তুত হয়। আবার ফসলের জন্য ক্ষতিকারক ইঁদুর সাঁপ খেয়ে ফেলে। (ছয়) আবার ক্ষতিকর কীটপতঙ্গগুলোকে আল্লাহ তা'আলা উপকারী প্রাণীর খাবার বানিয়েছেন। ফলে প্রকৃতিতে একটি ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশ তৈরী হয়েছে।

দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করা লাগবে কেন?

যত ইবাদত আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর ফরয করেছেন সেগুলো মু'মিন বান্দার আত্মশুদ্ধি ও আত্ম উন্নতির মাধ্যম। ইবাদত পালন করলে যত কল্যাণ অর্জিত হয়, সে তুলনায় চেষ্টা করা হয় অতি অল্প। আমরা ইবাদত পালনে অতি স্বল্প প্রচেষ্টাই ব্যয় করে থাকি। অথচ এর বিনিময়ে রাব্বে কারীম অজস্র প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সলাত এমন একটি ইবাদত যাতে ক্বিরাআত, যিকির ও দু'আর অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে। দাসত্বের সব শাখা এতে একত্র হয়েছে পরিপূর্ণভাবে। এককভাবে ক্বিরাআত, যিকির বা দু'আর চেয়ে সলাত অতি উত্তম ইবাদত। কারণ এতে সেই তিনটি ইবাদতের সমাহার ঘটেছে। সাথে এর মাধ্যমে সম্পাদিত হয় সব অঙ্গের ইবাদত।

মু'মিন বান্দা সলাত আদায় করে আনন্দিত হবে। বিরক্ত হবে না। কারণ তারা সলাতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার সাথে থাকে। যত চাওয়া আছে সব তাঁর নিকট ব্যক্ত করে। তিনিও তাদের ডাকে সাড়া দেন। আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্য আমরা সলাত আদা করি। আমরা তো রবের নির্দেশনা মোতাবেক কাজ করতে পছন্দ করি। আমরা তাঁর দাসত্ব করি। কারণ তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা। তিনি ইবাদত পাওয়ার একমাত্র যোগ্য সত্তা। আমাদের প্রতি তাঁর দান অজস্র অগণিত। রাব্বে কারীম এটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন: **'তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করলে তার সংখ্যা গুণে শেষ করতে পারবে না'**। (সুরা আন-নাহল, আয়াত নং-১৮)

এই যে ইবাদত.. এগুলো রবের প্রতি আমাদের ভালোবাসা আর কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ। তাঁর প্রতি আমাদের মুখাপেক্ষিতার স্বীকৃতি। যাতে তিনি আমাদের সুস্থ রাখেন, আমাদেরকে কল্যাণের তাওফীক দেন আর যত অনিষ্ট আছে সব আমাদের থেকে দূর করেন। আল্লাহ তা'আলার আমাদের ইবাদতের কোন প্রয়োজন আছে কি? বিলকুল না.. তিনি আমাদের থেকে অমুখাপেক্ষী। আমাদের আমলের কোন প্রয়োজন তাঁর নেই। এর দ্বারা তিনি বিন্দুমাত্র উপকৃত হন না। ইবাদতগুলো তো আল্লাহর পক্ষ হতে আমাদের জন্য কতগুলো নির্দেশনার সমষ্টি মাত্র। তিনি চান, আমরা যেন নাবীর দেখানো পন্থায় তাঁর ইবাদত করি। আবার এই ইবাদতগুলো জান্নাতে যাবার জন্য যে রসদের প্রয়োজন, সেই রসদ অর্জনের মাধ্যমও বটে। আল্লাহর হিকমাত হলো আমল সম্পাদন ছাড়া কোন বান্দাকে তিনি প্রতিদান দিবেন না। জান্নাত আল্লাহ তা'আলার অত্যন্ত দামী পণ্য। এটি খরিদ করতে অনেক মূল্য প্রয়োজন। আর সেই মূল্য হল সঠিকভাবে তাঁর আনুগত্য করা।

দোআতে যদি বলি, 'একদিনেই আমাকে বড় বানিয়ে দাও' কবুল হবে কি?

আল্লাহর নিকট দু'আ করার কতগুলো শিষ্টাচার আছে, যেগুলো রক্ষা করা অতি আবশ্যক। যেমন: আল্লাহ তা'আলা এই বিশ্ব পরিচালনার জন্য যে নিয়ম-নীতি প্রণয়ন করেছেন তার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা দেখানো। এই বিশ্ব চরাচরে সবকিছু ধীরে ধীরে বড় হবে, ক্রমান্বয়ে পূর্ণতায় উপনীত হবে– এটিই আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ম। এটি জানতে হবে, এর প্রতি তোমার শ্রদ্ধা দেখাতে হবে। আমরা আল্লাহর নিকট সবকিছু চাই কিন্তু তিনি আমাদের জন্য যা কল্যাণকর সেটিই করেন। আমরা যা কিছু চাই সব আমাদের জন্য কল্যাণকর নাও হতে পারে। ধরো, তুমি বাবার কাছে আবদার করলে গাড়ি চলার লেনে সাইকেল চালানোর। কোন বাবা কি এটি মানবে? কখনও না.. বরং সাথে সাথে প্রত্যাখ্যান করবে। কারণ তিনি তোমাকে অনেক ভালোবাসেন। তোমার কল্যাণের চিন্তা বাবার মাথাকে ব্যস্ত করে রাখে সর্বদা। তিনি জানেন, তোমার এ আবদার কবুল না করা-ই তোমার জন্য কল্যাণকর। আমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ এত বেশি যে, তিনি আমাদের কোন দু'আ-ই বিফল করেন না। বরং আদব রক্ষা করে করা প্রতিটি দু'আর জন্য তিনি তিনটি অবস্থা রেখেছেন। **(এক)** হয় তিনি সেই দু'আটি কবুল করে নিবেন। **(দুই)** অথবা এর মাধ্যমে আগত কোন বিপদ দূর করবেন। **(তিন)** অথবা ক্বিয়ামত দিবসের জন্য তিনি এর প্রতিদানটি গচ্ছিত করে রাখবেন।

আম্মু, আমি আমার পাশের বান্ধবীর মত সুন্দরী নই কেন?

দেখো, আল্লাহ তা'আলা সবাইকে স্বতন্ত্র শেকেল-সুরাত দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তোমার চেহারা-সুরাত একরকম, তোমার বান্ধবীর আরেক রকম। কেউ কারো মত নয়। তবে আল্লাহর সব সৃষ্টিই সুন্দর, অতি সুন্দর। রব্বে কারীমের ভাষায়: **'আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতর অবয়বে'**। (সুরা আত-তীন আয়াত নং-৪)

প্রত্যেকে স্বতন্ত্র তার নিজস্ব অন্যান্য সৃষ্টিশৈলী নিয়ে। আল্লাহ যাকে অপ্সরী করে সৃষ্টি করেছেন, তার কর্তব্য অধিক হারে রবের শুকরিয়া আদায় করা। আর যে অতি সুন্দরী নয়, তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে রবের সিদ্ধান্তে। গ্রহণ করতে হরে তাঁর ফায়সালা। যে কৃতজ্ঞ হবে, ধৈর্যধারণ করবে তার জন্য রয়েছে অঢেল সওয়াব। দুনিয়া আখিরাতে বৃদ্ধি পাবে তার মর্যাদা।

আল্লাহ যখন আমাদের ভালোইবাসেন তখন আমাদের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে কেন?

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে পরীক্ষা করেন। দেখতে চান, কে ভালো আর কে মন্দ। অনেক সময় তিনি মানুষকে পরীক্ষায় ফেলেন যাতে সে রবের আশ্রয় খোঁজ করে, সদা তাঁর কাছাকাছি থাকে। প্রিয় বান্দাদের পরীক্ষা করেন তাদের পরিশুদ্ধ করার জন্য, তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য। যাতে তারা অন্যদের জন্য আদর্শ হন। তাদের দেখে অন্যরা ধৈর্যধারণ করতে শেখে। বিপদ-আপদের ক্ষেত্রে তাদের অনুকরণ করে। নাবী ﷺ এর একটি হাদিসে আমরা এর উত্তর আরও স্পষ্টভাবে খুঁজে পাই। তিনি বলেন: **'সকল মানুষ অপেক্ষা নবীগণই অধিকতর কঠিন বিপদের সম্মুখীন হন। অতঃপর তাঁদের চেয়ে নিম্নমানের ব্যক্তি এবং তারপর তাদের চেয়েও নিম্নমানের ব্যক্তিগণ অপেক্ষাকৃত হালকা বিপদে আক্রান্ত হন'**। (সহীহুল জামে'-৯৯২)

বুঝা যাচ্ছে, প্রতিটি মানুষ তার দ্বীন অনুযায়ী পরীক্ষিত হবে। দ্বীনের উপর যে যত বেশি অটল থাকবে, তার পরীক্ষার তত কঠিন হবে। এজন্য নাবীদের পরীক্ষা অনেক কঠিন হয়েছে। আল্লাহর প্রিয়পাত্র হলেই যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটবে না– বিষয়টি মোটেও এমন নয়। বরং ব্যক্তির দ্বীন ও তাকওয়া অনুপাতে তার পরীক্ষার মাত্রা কমবেশি হবে।

এবার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তোমাদের বলি। ভালোভাবে মাথায় গেঁথে নিতে হবে। কেমন? ইনশা আল্লাহ.. এ রাজত্ব কার? আল্লাহ তা'আলার। তাই না? অবশ্যই.. তাঁর রাজত্বে তিনি যা ইচ্ছা তাই করবেন। যা খুশি তাই অর্ডার করবেন। তাঁর কর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করবার কেউ আছে কি? নাই। কারণ তিনিই তো আহকামুল হাকিমীন।

এগুলো সর্বাধিত উচ্চারিত প্রশ্ন। অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর চেয়ে বা উত্তরের আরো ভালো নমুনা প্রস্তাব করে ইমেইলে যোগাযোগকে আমরা স্বাগত জানাবো।

(jrakaf@gmail.com)

শেষের কথাঃ

উপসংহারে আমরা তারবীয়্যার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কতগুলো বিষয় সুপারিশ করেছি। যথাঃ

- দীর্ঘ মেয়াদি তারবিয়্যা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে পিতা-মাতাদের শিক্ষাদানের প্রচেষ্টা জোরদার করা উচিত। কারণ তারা সঠিক শিক্ষা-দীক্ষায় বলীয়ান প্রতিশ্রুত প্রজন্ম প্রস্তুতকরণের কেন্দ্রিয় অবলম্বন।
- ইসলামী ভাবধারার কার্টুন ফিল্ম এবং বিভিন্ন টেলিভিশন প্রোগ্রাম ডিজাইন করা। প্রযুক্তি ও উৎকৃষ্ট মান বজায়ে এগুলো হতে হবে আন্তর্জাতিক ক্যাটাগরীর। তাহলে তা মনোযোগ কাড়বে এবং দর্শক টানতে সক্ষম হবে।
- শিশুদের জন্য উদ্দেশিত টিভি প্রোগ্রাম প্রনয়ণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন গবেষণাকর্ম এবং কনফারেন্সের আয়োজন আর এগুলোকে নানাভাবে প্রণোদনা দেওয়া। ফলে আমাদের ভাবধারার সাথে সংগতিপূর্ণ কিছু প্রোডাক্ট তৈরী হবে। অবারিত হবে বিনোদনের বিকল্প প্লাটফর্ম।
- শিশু সংস্কৃতির ময়দানে আরবি ভাষার কন্টেন্ট এখনও নিঃস্ব অবস্থায় রয়েছে। যা আছে তার অধিকাংশ বিভিন্ন পরিবেশের সংস্কৃতিবাহী অনুবাদ কর্ম মাত্র। নিজস্বতা বলতে তেমন কিছুই নেই। একই দশা আমাদের বাংলা ভাষাতেও। আরবি লাইব্রেরীর এই অভাব পূরণে প্রচেষ্টা বহুগুণে বর্ধিত করা উচিত।
- শিশুদের ঈমানী প্রতিপালনের ক্ষেত্রগুলোতে প্রশিক্ষণমূলক প্রোগ্রাম ডিজাইন করা। বিশেষভাবে এই ক্ষেত্রে যারা প্রশিক্ষক, পরামর্শক রয়েছেন তাদেরকে যোগ্য করা। এই প্রোগ্রামগুলোর লক্ষ্য শিশুদের শিক্ষাদানের বিভিন্ন স্তরে নিয়োজিত অভিভাবক ও শিক্ষকগণ।
- জাতীয় শিক্ষা কারিকুলামের উন্নতি সাধন। তাতে যোগ করতে হবে তারবিয়্যাহ এবং শিক্ষামূলক নানা উপাদান যা শিশুদের সমসাময়িক ঈমানী জিজ্ঞাসার সমাধান দিবে পরিপূর্ণভাবে।

مركز أصول
OsoulCenter
www.osoulcenter.com

osoulcenter
+966504442532
www.osoulcenter.com

عرض تعريفي عن مركز أصول
ومجالاته ووحداته.. مشاهدة ممتعة لك

ISO 9001
حاصل على شهادة
الاعتماد من الأيزو

حاصل على جائزة التميز
في العمل الخيري

শৈশবের এই অধ্যায়ে একজন শিশুর জানার উৎস তার পিতা-মাতা। তাই পিতা-মাতা কতৃক শিশুর প্রতিপালন ভালো হলে সন্তান সঠিক পদ্ধতিতে ভালোভাবে গড়ে উঠবে। সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্ব তাদের কাঁধে অর্পিত। প্রিয় নাবীর ভাষায় এটিই বিবৃত হয়েছেঃ 'তোমরা সকলেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের সকলকেই নিজ নিজ অধীনস্তদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে'। (সহীহুল বুখারী, হাদিস নং-২৫৫৮)

সত্যি বলতে, আমরা শাহাওয়াত (প্রবৃত্তি) ও শুবুহাতের (সংশয়) ফিতনায় ভরপুর এক সময়ে বসবাস করছি। ফলে সন্তান প্রতিপালনে আন্তরিকতাপূর্ণ সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা প্রতিটি পিতা-মাতার আবশ্যকীয় দায়িত্বে পরিণত হয়েছে। সন্তানদের অন্তরে পিতা-মাতা কর্তৃক রোপিত একটি বীজ মৃত্যুর পরে তাদের জন্য সাদাকায়ে জারিয়াহ হিসেবে ফল দিবে। বস্তুত সন্তান হলো সেই স্থায়ী আমাল যা মৃত্যুর পরেও অব্যাহত থাকে। প্রিয় নবীজী ﷺ আমাদের এটিই জানিয়েছেনঃ 'অথবা পুণ্যবান সন্তান যে তার জন্যে দু'আ করবে'। (সহীহ মুসলিম, হাদিস নং১৬৩১-)

osoulcenter
9001
www.osoulcenter.com
To Download This Book, please Visit:
OSOUL osoulstore.com